যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল উপাধি প্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে

উপস্থাপিত গবেষণাসন্দর্ভ

মিখাইল বাখতিনের সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর দু'টি উপন্যাসের পাঠ

গবেষক

পৃথা সরকার

রেজিস্ট্রেশন নং - 115286 of 2011-12

ক্রমিক সংখ্যা - 001700103010

পরীক্ষা ক্রমিক সংখ্যা - MPBE194010

তত্ত্বাবধায়ক

গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Certified that the thesis entitled "বাখতিনের সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর দু'টি উপন্যাসের পাঠ" submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Department of Bengali of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Pritha Sarkar.

Registration Number : 115286 of 2011-12

Roll Number : MPBE194010

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Pritha Sarkar entitled "মিখাইল বাখতিনের সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর দু'টি উপন্যাসের পাঠ" is now ready for submission towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Department of Bengali of Jadavpur University.

....

Head Supervisor & Convener of RAC Member of RAC

Department of Bengali

প্রস্তাবনা

আমার এম.ফিলের গবেষণার বিষয়টি হল –" মিখাইল বাখতিনের সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর দুটি উপন্যাসের পাঠ"। এম.ফিল প্রথম বর্ষে মিখাইল বাখতিন সম্পর্কে পড়তে গিয়ে তাঁর উপন্যাসতত্ত্ব সম্পর্কে এক গভীর আগ্রহ জাগে। উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে তার গভীর আলোচনাগুলিকে আরও নিবিড় ভাবে জানার আগ্রহ জাগে, সঙ্গে এই ভাবনাটিও কাজ করে বাংলা সাহিত্যের কোন উপন্যাসের পাঠে বাখতিনের তত্ত্বকে খুঁজে দেখা যেতেই পারে। তার ডায়ালজি, পলিফনি , কার্নিভাল প্রভৃতি তত্ত্বের মধ্যে নিহিত থাকা সুরকে খুঁজে দেখার এক ইচ্ছা বলা যেতে পারে। যে কোন সাহিত্য শিল্পের রূপায়নের রহস্যটি বারবার খুঁজে দেখতে ইচ্ছা হয় , এরকম এক আগ্রহ থেকেই মনে হয় বাখতিনের তত্ত্বের নিরিখে যদি সতীনাথ ভাদুড়ীর অসামান্য দুই উপন্যাসে দ্বিবাচনিকতার পরিসরকে খোঁজা যায়।

আলোচনার সীমিত পরিসরে অনেক কিছুই বলা হয় নি, আবার একথাও ঠিক একজন বিদেশী তাত্ত্বিকের তত্ত্বকে বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে খুঁজতে গিয়ে সব সময় যে হুবহু মিল পেয়েছি তাও নয়, তবুও খুঁজে দেখার পরিসর যথেষ্টই ছিল । আর এই গবেষণার কাজটিকে পরিপূর্ণ রূপদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেন আমার পথপ্রদর্শক অধ্যাপক গোপা দত্ত। তাঁর সহযোগিতা, ও পরামর্শ ছাড়া কাজটির সম্পূর্ণ রূপদান সম্ভব হত না। এছাড়াও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (সেন্ট্রাল লাইব্রেরী) থেকে প্রয়োজনীয় বহু গ্রন্থ পেয়েছি যা গবেষণার কাজে অনেক সাহায্য করেছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা - জীবন ও রচনার নানা পরিসর : বাখতিন ও সতীনাথ ১-৬

প্রথম অধ্যায়— বাখতিনের রচনার প্রেক্ষিতে তাঁর তত্ত্বের নানা পরিসরকে জানা ৭-১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়— সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী'— বাখতিনের তত্ত্বের আলোকে ১৭-৩১

তৃতীয় অধ্যায়— বাখতিনের তত্ত্বের নিরিখে— ঢোঁড়াই চরিত মানস ৩৩-৫৪

উপসংহার— ৫৫- ৫৮

গ্রন্থপঞ্জি— ৫৯-৬১

ভূমিকা

জীবন ও রচনার নানা পরিসর : বাখতিন ও সতীনাথ

সাহিত্যচিন্তায় ও রসাস্বাদনে সাহিত্যতত্ত্বের একটি ভূমিকা চিরকালই রয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সাহিত্যতত্ত্বেই মহান চিন্তকরা আবির্ভূত হয়েছেন। তবে বর্তমান সাহিত্য জগতে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে । আধুনিক সাহিত্যকে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব দিয়েই প্রধানত বিচার করা হয়। তত্ত্ব নিয়ে এত বেশি অভিনিবেশের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় প্রকার মতামতই পাওয়া যায়। টেরি ইগল্টন তাঁর 'The significance of theory' (Blackwell,1990) প্রবন্ধে তত্ত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনের পক্ষে অনেক কথাই বলেন। তিনি থিওরিকে জীবনের বাইরের কোন বিচ্ছিন্ন বস্তু রূপে দেখতে চাননি, যেখানেই জীবন সেখানেই থিওরি। জীবনের যে কোন দিক বা কর্মের বিষয়েভাবলে দেখা যাবে সেখানেও থিওরি বর্তমান। অর্থাৎ সমাজ জীবনের যেকোন ঘটনারই একটা তত্ত্বগত তাৎপর্য থেকেই যায়।

সাহিত্যের একটি বিশেষ সংরূপ হল উপন্যাস – এই উপন্যাসের তত্ত্বগত দিক সম্পর্কে জানতে গিয়ে রুশ দেশের এক মহান তাত্ত্বিকের সঙ্গে পরিচয়, যিনি মূলত উপন্যাসের তত্ত্ব কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেন, তিনি হলেন- মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন। ১৮৯৫ খ্রিঃ ১৬ ই নভেম্বর মস্কোর ওরেল প্রদেশে তাঁর জন্ম।

বিশ শতকের বিশিষ্ট রাশিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক হলেন মিখাইল মিখাইলোভিচ বাখতিন। তাঁর কাজ মূলত উপন্যাসের শৈলীবিচার ও তত্ত্ব কাঠামো নিয়ে। জন্মসূত্রে রাশিয়ান হলেও ছেলেবেলা থেকেই জার্মান মহিলার সাহচর্যে বেড়ে ওঠার ফলে – জার্মান ও রুশ উভয় ভাষাতেই দক্ষতা

অর্জন করেন তিনি, তখন থেকেই দ্বিভাষিক পরিবেশে তাঁর সত্তার নির্মাণ শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাস তত্ত্বের ভিত্তিভূমি স্থাপন করে। মূলত দস্তয়েভস্কির রচনাকে অবলম্বন করেই উপন্যাসের শৈলী বিচার করেন তিনি। সম্ভবত ১৯২০ নাগাদ তাঁর লেখা প্রথম রচনা "Author and hero in aesthetic activity"প্রকাশিতহয়।এর আগে অবশ্য ১৯১৯ এ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয় তাঁর একটি ক্ষুদ্র রচনা 'Art and Answerability'। তবে যে কাজটির জন্য তিনি সর্বাধিক আলোচিত সেটি হল- Problems of Dostoevsky's poetics, ১৯২০ নাগাদ শুরু হয়ে, শেষ হয় ১৯২৯ এ- এটিই তাঁর গবেষণার ভিত্তিভূমি। এছাড়াও ১৯৬৫ তে প্রকাশিত হয় Rabelais and His World. এই দুটি বই থেকে আমরা বাখতিন বিশ্বের দুটি মূল ধারনা পাই- পলিফনি ও কার্নিভাল। এছাড়াও The Dialogic Imagination(সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত ১৯৭৫) নামক প্রবন্ধ সংকলনে চারটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যার থেকে উপন্যাসের ক্ষেত্রে ডায়ালগিজম, হেটেরোগ্লসিয়ার ধারনা পাই।

কিশোর মিখাইল বাবার বদলির চাকরির সূত্রে ভিলনিয়াস শহরে বসবাস করেন বেশ কিছুদিন, যেখানে ভাষা, ইতিহাস, ধর্মীয় বৌদ্ধিক চর্চার মেলবন্ধনের ফলে তাঁর মধ্যে একপ্রকার বহুস্বরিকতার জন্ম হয়। দাদা নিকোলাইয়ের সূত্রে ১৯০৭ নাগাদ মিখাইল নানা রকম আলোচনাচক্রে আকৃষ্ট হন, যেখানে মার্ক্স – এঙ্গেলস এর বৈপ্লবিক তত্ত্বচিন্তা থেকে শুরু করে, ধীরে ধীরে নীৎশে, বোদলেয়ার, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং প্রতীকবাদী কবিতা হয়ে ওঠে তাঁর অভিনিবেশের বিষয়। ১৯১৪ এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিখাইল সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব শাখার ধ্রুপদীবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হন। এখানে তাঁর চিন্তায় পূর্বসূরিদের ধারণাকে বিরোধিতা করে প্রতীকবাদের বিরোধী ভাবনার প্রসার দেখা যায়। ১৯১৭ রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরপরই বাখতিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। এই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁর জীবিকা ও চিন্তাজীবনে প্রভাব ফেলে, মোটামুটি ১৯২৫ এর পর

থেকে বাখতিনের চিন্তাজগতের সমৃদ্ধির সময়, মার্ক্স, ফ্রয়েড প্রমুখ চিন্তাবিদদের ধ্যানধারণা তাঁকে প্রভাবিত করে। এরপরও সারাজীবন-ব্যাপী তাঁর চিন্তার অনেক বিনির্মাণ ঘটে। যা তাঁর তত্ত্বগত ভাবনাকে কখনও সরলরৈখিক হতে দেয়নি, দ্বিবাচনিকতার অনন্ত পরিসর তৈরি করেছে।

বাখতিনকে জানতে গেলে জানতে হবে রুশ রূপবাদকে, এটি একটি সাহিত্যিক আন্দোলন, যা রুশ বিপ্লবের দু এক বছর আগে শুরু হয়। গঠনবাদের সাথে এদের ভাবনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাখতিনকে রূপবাদী ও গঠনবাদীদের সংযোগসূত্রকারী বলা যেতে পারে। রুশ রূপবাদীরা রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপেক্ষা করে সাহিত্যের বস্তুগত দিককে প্রাধান্য দিলেন। সাহিত্যের অনুশীলন কিছুটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে করতে চাইলেন। তাঁরা এমন সব তত্ত্ব, নিয়মনীতির খোঁজ করলেন যাতে বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাহিত্যকে বিচার করা যায়। কিন্তু তাঁরা এখানেই থেমে থাকলেন না, সাহিত্যের সামাজিক দায়িত্বের দিকটি নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরুকরলেন। রুশ রূপবাদের শেষ যুগের চিন্তাবিদরা তাই রূপবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করলেন। বাখতিন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা বলতে মোটামুটি এটিই ।

গবেষণাসন্দর্ভটির বিষয় যেহেতু বাখতিনের উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সতীনাথ ভাদুড়ীর দু'টি উপন্যাসের পাঠ, তাই আমাদের বাখতিন সম্পর্কে ধারনার পাশাপাশি , সতীনাথ সম্পর্কেও কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। সতীনাথ ভাদুড়ী এমন একজন কথাসাহিত্যিক, যাকে কালসচেতন বাস্তবশিল্পী বলা যায়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। যদিও জনপ্রিয় লেখক রূপে তাঁর স্বীকৃতি কম। তাঁর স্বল্পস্থায়ী লেখক জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'জাগরী' (১৯৪৫) আর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ

(১৯৪৯,১৯৫১)। এছাড়াও চিত্রগুপ্তের ফাইল (১৯৪৯), সত্যি ভ্রমণকাহিনী (১৯৫১), অচিনরাগিণী (১৯৫৪) প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন।

সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর সাহিত্য শিল্প সম্পর্কে নিজস্ব একটি ধারণা পোষণ করতেন, বিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর এই ধারণার কথা তিনি নানা জায়গায় বলেছিলেন, বিশেষত তাঁর ডায়েরিতে। তিনি সময়ের চাহিদাকে বুঝতে সক্ষম ছিলেন, তাই এটা বুঝতে পারেন যে তাঁর সমসাময়িক সময়টা কথাসাহিত্যের যুগ, আর সেই কারণেই গল্প , উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। সমাজের প্রতি লেখকের দায়বদ্ধতা নিয়ে তিনি সচেতন ছিলেন, সেই দায়বদ্ধতা হল সমাজের গভীরে লুকিয়ে থাকা সমস্যাগুলির উন্মোচন করা।

সতীনাথের জীবনের সঙ্গে পূর্ণিয়ার যোগ নিবিড়, আমরা জানি তাঁর পিতার ওকালতির সূত্রে তাঁরা পূর্ণিয়াতে বসবাস করতেন। ওখানেই তাঁর জন্ম (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর)। এরপর বাল্যশিক্ষা, কর্ম, রাজনীতিতে যোগদান ও ত্যাগ, সাহিত্য সাধনা সবই ওখানে। তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন পূর্ণিয়াকে ও পূর্ণিয়ার মাটি সংলগ্ন মানুষকে । 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' ধারণ করে আছে এই পূর্ণিয়ার জলবায়ু, জীবনধারা, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশ। সতীনাথ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ এ অর্থনীতিতে এম.এ পাশ করেন ও ১৯৩১ এ পাটনা ল কলেজ থেকে বি.এল পাশ করে ওকালতিতে যোগ দেন। ওকালতি জীবনে অবসর সময়ে সাহিত্যচর্চা করতেন। ১৯৩২-৩৮ সাল পর্যন্ত ওকালতি করেন তিনি, এই সময়টা সাধারণ ভাবেই জীবনযাপন করেন তিনি। ১৯৩০ এ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের প্রভাব বিহার অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। অসহযোগের সময় পরিপূর্ণ রাজনীতি না করলেও সতীনাথ সঙ্গীদের নিয়ে পিকেটিং করেন। ১৯৩৪ এ গান্ধীজী পূর্ণিয়া আসেন এবং নওরত মাঠে ভাষণ দেন- সতীনাথ সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'ঢোঁড়াই

চরিত মানসে' ঢোঁড়াই ও সাগিয়ার গান্ধী দর্শন, বা মরণাধারের কাছে লবণ সত্যাগ্রহের চিত্র আসলে লেখক সতীনাথেরই বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। ১৯৩৯ সালের ২৪ শে সেপ্টেম্বর সতীনাথ পূর্ণিয়ার টিকাপট্টির আশ্রমে যোগ দেন, এই সময় থেকেই তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী বলে গণ্য হন। ওকালতির অবসরে তিনি রাজনীতি, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ, ক্যাপিটালিজম, সোস্যালিজম, রাশিয়ার অর্থনীতি, সমাজনীতি নিয়ে গভীর ভাবে পড়াশোনা করেন। সতীনাথ কখনও রাজনৈতিক গোঁড়ামিকে প্রশয় দেননি। ১৯৩১ এ তিনি সোস্যালিস্টদের পক্ষপাতী ছিলেন, আবার কম্যুনিস্টদের সংগঠন ক্ষমতার প্রশংসা করতেন।

সতীনাথ ভাদুড়ীর কোন উপন্যাস শ্রেষ্ঠ, এর বিচারে বলতে হয় , জাগরীর লোকপ্রিয়তা সর্বাধিক, তা আঙ্গিকের জন্যই হোক বা রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির জন্যই হোক।রাজনীতির সূক্ষ্মজাল ছড়িয়ে আছে গোটা উপন্যাসে, রাজনৈতিক বিশ্বাস আর মতাদর্শের দ্বন্দ্ব কীভাবে পরিবার জীবনে ছায়াপাত করে তা এখানে দেখানো হয়েছে।

কিন্তু সতীনাথ নিজে এবং অন্য অনেকে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলতে চান। গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে, উপন্যাসটি বিষয় ও রচনারীতি, ভাষার দিক থেকে অনেকটাই অন্যরকম। এই উপন্যাস সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সতীনাথ গ্রন্থাবলীতে তাঁদের ভূমিকায় লিখেছেন –

" লেখকের এই পক্ষপাতের কথা যদি ভুলেও যাই আমরা, তা হলেও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' বিষয়ে আমাদের বিস্ময় কখনো কমে না। এ কেমন উপন্যাস যার পাতায় পাতায় দরকার হয় পাদটীকার? এ কেমন উপন্যাস যার নায়কের নাম 'ঢোঁড়াই'? এর ঘটনাভূমি আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশ নয়, বিহার। এখানে নেই আমাদের অভ্যস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কোনো ছবি, এর জগৎটা গড়ে উঠেছে 'অন্ত্যজ' ধাঙড় আর তাৎমাদের নিয়ে।"

সতীনাথ ‘উত্তর ঢোঁড়াইচরিত’ লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লেখেন নি, কারণ মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে আর পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে, এই বিষয়ে নিজের অপর্যাপ্ততা ভালোভাবে বোঝবার পর সে সংকল্প ত্যাগ করেন।

আসলে সতীনাথ ভাদুড়ীর ঔপন্যাসিক সত্তা নিছক কাহিনিতে তৃপ্ত হতে পারেনি কখনও, আবার শুধুমাত্র একটি বিশেষ রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক সময়ের নথিরক্ষকও হতে চাননি তিনি।উপন্যাসে তিনি খুঁজেছেন সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সংবেদন। উপন্যাস তাঁর কাছে কখনই সমকালীন আবেদনেই ফুরিয়ে যেতে পারে না, তাকে বিগত ও আসন্ন কালের সঙ্গে এক বহুমাত্রিক দ্বিবাচনিকতা নির্মাণ করতে হয়। সেই কারণেই ‘জাগরী’ বা ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ এর ঔপনিবেশিক সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষিত এখন আর না থাকলেও পুনঃপাঠের সূত্রে নতুন নতুন তাৎপর্যে আমরা উপন্যাস দুটিকে পড়তে চাই। এরকমই এক ভাবনা থেকেই বাখতিনের তত্ত্বের দ্বিবাচনিকতার নিরিখে সতীনাথ ভাদুড়ীর সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস দুটির পুনঃপাঠের আকাঙ্ক্ষা জাগে।

প্রথম অধ্যায়

বাখতিনের রচনার প্রেক্ষিতে তাঁর তত্ত্বের নানা পরিসরকে জানা

- দস্তয়েভস্কির পলিফনিক নভেল -

রুশ ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কির বৃহদায়তন সাহিত্য যে ছাপ রেখে যায় তাতে single author artist, অর্থাৎ যিনি গল্প বা উপন্যাসটি লিখছেন তাঁর সাথেই কেবল সংযোগ করে না , তার বদলে সেখানে থাকে বহু দার্শনিক বাচন যা একাধিক author thinker দ্বারা সৃষ্ট, যেমন Raskolnikov, Ivan Karamazov প্রমুখ অনুসন্ধানকারী ও অন্যান্যরা। দস্তয়েভস্কির কাজগুলি কিছু অসম, পরস্পরবিরোধী দার্শনিকক্রমে সাজানো, যেখানে একে অপরকে রক্ষা করে। কিছু পণ্ডিতবর্গের মতে দস্তয়েভস্কির কণ্ঠস্বর (voice), তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর কণ্ঠস্বরের সাথে সম্পূর্ণ রূপে মিশে যায় বা যুক্ত হয়। অর্থাৎ লেখকের কণ্ঠস্বর অন্য সব স্বরের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়। চরিত্রগুলি কেবলমাত্র দস্তয়েভস্কির শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় হয়ে থাকে না – তারা ভাষাদর্শগত ভাবে স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য হয়। চরিত্রগুলি নিজেই একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাষা জগৎ বহন করে।

B.M.Engelhardt কিছুটা সঠিক ছিলেন এই বিষয়ে যে দস্তয়েভস্কির রচনায় অদ্ভুত বলে কিছু নেই। “A survey of Russian Critical literature on Dostoevsky’s Work” গ্রন্থে তিনি লেখেন- একবার মাত্র দেখায় মনে হতে পারে দস্তয়েভস্কির প্রিয় চরিত্ররা আধ্যাত্মিকতার উপর ওঠেনি, যদিও এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে, বরং

উপাদান সমূহ এদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বে রাখে। ইভান কারমাজভ্, রাসকলোনিকভ প্রমুখ চরিত্র থেকে এটা বোঝা যায়, যে এরা নিজেদের সৃষ্ট দ্বন্দ্বে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে, সমস্যার সামনে অপ্রতিভ হয়ে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে নিজেদের মাথা নত করে।

বাখতিন তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, দস্তয়েভস্কি পলিফনিক নভেলের স্রষ্টা। তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক ঔপন্যাসিক রীতি সৃষ্টি করেন। তাঁর শৈল্পিক সৃষ্টিতে একজন হিরোর কণ্ঠস্বর গঠিত হয় এমন ভাবে, যেটা কখনই লেখকের একান্ত কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়না। এখানে আসলে লেখকের বাচন ও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের বাচন পাশাপাশি সহাবস্থান করে। চরিত্রকে লেখকের মুখপাত্র বলে মনে হয় না। চরিত্র তার নিজের সম্পর্কে ও নিজের জগৎ সম্পর্কে যে শব্দগুলি ব্যবহার করে সেগুলি সম্পূর্ণ ভরযুক্ত, ঠিক লেখকের কণ্ঠস্বরের মতো।

সাধারণ প্লটের ধারণা এইসব উপন্যাসে বদলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ প্লটের সংযুক্তি যেন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত বা মেনে নেওয়া, চরিত্র যেখানে কেবলমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থেকে যায়, সেখানে লেখকের পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উপাদান (Fixed element) হয়েই থেকে যায় চরিত্ররা।

দস্তয়েভস্কির রচনায় যে পজিশন থেকে গল্পটা বলা হয়, চিত্রাঙ্কন করা হয়, বা তথ্য গুলি দেওয়া হয়, সেটা সম্পূর্ণ নতুন এক পথে- এই চিত্রাঙ্কনের জগৎটাও নতুন- 'A world of autonomous subjects, not objects' – কখনই চরিত্রগুলি বা ঘটনাগুলিকে গল্পের উপাদান (object) বলে মনে হয় না, তারা স্বাধীন স্বশাসিত বিষয় রূপেই ধরা দেয়।

Kaus দস্তয়েভস্কির রচনার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ব্যাখ্যা করেন। Kaus এর দাবি দস্তয়েভস্কির জগৎ হল পুঁজিবাদ বা capitalism এর বিশুদ্ধ ও খাঁটি অভিব্যক্তি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং যে অন্য সকল দিকগুলি দস্তয়েভস্কির উপন্যাসকে নাড়া দেয় সেগুলি সবই পুঁজিবাদ পূর্ববর্তী যুগে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, সংগঠিত। প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন (isolated unit), একে অপরের সঙ্গে

কোন সংযোগ ছিল না, - কিন্তু পুঁজিবাদ এই বিচ্ছিন্ন জগতের ধারণাকে ধ্বংস করে। এই জগতে নিজেদের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না। পুঁজিবাদ সেই সংযোগসূত্র তৈরি করল কিন্তু তাদের স্বাতন্ত্র্য কে নষ্ট না করেই। কিন্তু তারা আর স্বয়ংসম্পূর্ণ রইল না। - পলিফনিক নভেল বাস্তবিকই পুঁজিবাদী যুগের ফল।

দস্তয়েভস্কির অসাধারণ শৈল্পিক ক্ষমতা হল সবকিছুকে যুগপৎ দেখা ও তাদের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া ঘটানো। এটা একাধারে তার শক্তি, কিন্তু আবার এটা তার গভীর দুর্বলতাও। বাস্তবতার বহু দিক তাঁর শৈল্পিক চর্চার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু এই উপলব্ধি তাঁকে সাহায্য করে বহুমুখী বিষয়কে দেখতে, যেখানে অন্যরা কেবল একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করেন, সেখানে তিনি দুটি চিন্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। যেখানে অন্যরা কেবলমাত্র একটি গুণকে প্রত্যক্ষ করেন। সেখানে তিনি দ্বিতীয় ও পরস্পরবিরোধী গুণকে আবিষ্কার করতে সক্ষম। সবকিছু, যা আপাতভাবে সরল বলে মনে হয় সেগুলি জটিল এবং বহুমুখী গঠন সম্পন্ন হয়ে ওঠে। প্রতিটি স্বরে শোনা যায় দুটি প্রতিবাদী স্বর।

আসলে দস্তয়েভস্কি ডায়ালজিক সম্পর্ক সবকিছুর মধ্যেই দেখতে পান, সকল প্রকাশ ও বুদ্ধিদীপ্ত সচেতন জগতের সর্বত্র – যেখানে সচেতনতা শুরু হয় সেখানে ডায়ালগ ও শুরু হয়। একমাত্র বিশুদ্ধ যান্ত্রিক সম্পর্ক ডায়ালজিক নয়, এবং দস্তয়েভস্কি সুনিশ্চিত ভাবে জীবনকে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার জন্য এবং মানুষের ক্রিয়াকর্মের জন্য তাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন। এইভাবে তিনি বাইরে ও অন্তরে সকল সম্পর্ক, সকল উপাদানের মধ্যে চরিত্রগতভাবে ডায়ালজিক উপাদানকে দেখেন, এবং তিনি উপন্যাসকে গঠন করেন এমনভাবে, যেন সেটি একটি মহান ডায়ালগ।

- উপন্যাসে নায়ক ও লেখকের অবস্থান

বাখতিনের সারগর্ভ গবেষণাধর্মী আলোচনা থেকে দস্তয়েস্কির শিল্প সম্পর্কে জানা যায়। এই জটিল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আমাদের দৃষ্টিকোণ আরও স্পষ্ট হয়। গবেষণাকর্মের তিনটি দিকের দিকে দৃকপাত করলে দেখব- হিরোর স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা এবং পলিফনিক নকশায় হিরোর কণ্ঠস্বর কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

দস্তয়েভস্কির কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে হিরো কীভাবে জগতে প্রতিভাত হচ্ছে বা ধরা দিচ্ছে, বরং এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জগৎ কী ভাবে হিরোর কাছে ধরা দিচ্ছে এবং হিরো নিজের কাছে নিজে কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। এটাই দস্তয়েভস্কির কোন গল্পের চরিত্র অনুভব করার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। - "what is important to Dostoevsky is not how his hero appears in the world but first and foremost how the world appears to his hero, and how the hero appears to himself."(Problem'sof Dostoevsky's Poetics, page 47) এখানে যেটা আবিষ্কার করা হয় তা হিরোর existence বা উপস্থিতি নয় বা তার পূর্ব নির্ধারিত কোন ইমেজ নয় বরং সেটা হিরোর জগত ও জীবন সম্পর্কে সচেতনতা ও আত্মসচেতনতার যোগফল, সর্বোপরি হিরোর চূড়ান্ত জগত তার নিজের কাছে কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে সেই দর্শন।

অতএব এই উপাদানগুলি যার থেকে হিরোর ইমেজটি রচিত হয়, তা আসলে বাস্তবের বৈশিষ্ট্য নয় – হিরোর নিজের বৈশিষ্ট্য। হিরোর ইমেজ তৈরি করতে একজন লেখক, হিরোর সামাজিক অবস্থান, তার স্বভাব, তার সামাজিক, আধ্যাত্মিক চরিত্রগত অবস্থান এমনকি তার শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এই সব কিছুকে ব্যবহার করেন। who is he– হিরোর আত্মদর্শন এটা, তার

আত্মসচেতনতার বিষয় ও লেখকের কল্পনার বিষয়। দস্তয়েভস্কির উপস্থাপনায় সেই আত্মদর্শনই ক্রিয়া বা function রূপে প্রতিভাত হয়।

এমনকি গোগোলিয়ান পিরিয়ডে দস্তয়েভস্কির সাহিত্যের অগ্রগতির শুরুর দিকে তিনি তার হিরোকে বাধ্য করেন আয়নায় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে। আমরা এটা দেখি না, কে হিরো, বরং এটা দেখি কেমন করে নায়ক তার নিজের সম্বন্ধে সচেতন, আমাদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি নায়কের বাস্তব জগতকে খোঁজে না বরং নায়কের বাস্তবতাপূর্ণ সচেতনতাকে খোঁজে।– এই ভাবে গোগোলিয়ান হিরো দস্তয়েভস্কির হিরো হয়ে ওঠে। হিরো নিজেকে আলোকপ্রাপ্ত করে বিভিন্ন সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে, লেখক কোনোভাবেই নায়কের বাস্তবকে আলোকপ্রাপ্ত করেন না বরং আত্মসচেতনতা ফুটিয়ে তোলেন।

কেবল নায়কের নিজস্ব বাস্তব নয়, নায়কের প্রাত্যহিক জগৎ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে নায়কের দৃষ্টিকোণে বদল হয়। দস্তয়েভস্কি এমন হিরো চান যে সচেতন হবার কাজকে প্রাথমিক ভাবে আয়ত্ত করে, হিরোকে এমন ভাবে সাজানো হয় যার জীবন নিজের প্রতি এবং জগতের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় মনোযোগী হয়।

‘Notes from The Underground Man’ এর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, হিরো ভাবছে, যদি আমি অলসতার বশবর্তী হয়ে কিছুই না করে থাকি তবে আমি কিভাবে নিজেকে সম্মান করব? কিন্তু আমার নিজেকে সম্মান করা উচিৎ, যেহেতু আমি অন্তত অলসতা করার যোগ্য, এটি অন্তত আমার মধ্যে একটা পজিটিভ কোয়ালিটি, যেহেতু এটি হল এমন জিনিস যা আমি করতে পারি বলে আমার বিশ্বাস। Underground এর হিরো যেন আড়াল থেকে আড়ি পেতে শুনতে পায় সেই সকল কথা যা অন্যরা তার বিষয়ে বলছে। অন্যের মনের আয়নায় সে যেভাবে প্রতিফলিত হয় , সে নিজেকে সেভাবে দেখার চেষ্টা করে, সে জানে ওই আয়নায় তার

ইমেজের সমস্ত সম্ভাব্য দিকগুলি প্রতিফলিত হবে – এটাকে সে point of view হিসাবে গ্রহণ করে। সে এটিও জানে তার প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তার ধারণা ঠিক কী। Point of view হিসাবে সে third person (প্রথম পুরুষ) ব্যবহার করে, সে এটাও জানে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত সে নিজেই দেবে।

'Notes from The Underground Man' এ দস্তয়েভস্কির প্রথম আইডিওলজিক্যাল হিরোকে পাই। সেই আইডিয়াটা হল মানুষের ধারণা কখনোই চূড়ান্ত নির্ধারিত নয়, যাকে কোন নির্দিষ্ট মাপে ফেলে সংজ্ঞায়িত করা যায়, বা দৃঢ় কোন সিদ্ধান্তে আসা যায়, "man is free, and can therefore violate any regulating norms which might be thrust upon him."(The hero in Dostoevsky's art, page-59) মানুষ স্বাধীন, আর তাই সে যে-কোন নিয়মকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা তার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে।

দস্তয়েভস্কির হিরোরা অন্য চরিত্রগুলি তার সম্পর্কে শব্দ দিয়ে যে জগৎ তৈরি করে তাকে ভেঙ্গে দিতে চায়, - কারণ অন্যদের তৈরি শাব্দিক জগৎ হিরোর চরিত্রকে অন্তিম সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাকে মৃত করে দেয়। কোনো কোনো সময় চরিত্রের কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়।

'Crime and Punishment' রচনায় সেই স্মরণীয় কোর্টের তদন্তকারী Porfiry Petrovich সাইকোলজিকে বলে (double edged sword) দুদিক থেকে ধারওয়ালা তরবারি। সে ইনটিউশন বা স্বজ্ঞা দ্বারা রাসকলোনিকভের এর অমীমাংসিত মনকে খুঁজে বার করে। Porfiryআর Raskolnikovএর মধ্যে তিনবার যে সাক্ষাৎকার হয় তা সাধারণ তদন্তের পদ্ধতি থেকে আলাদা, তারা তদন্তকারী ও অপরাধীর মধ্যে যে প্রচলিত মানসিক সম্পর্ক গড়ে

ওঠে তাকে অমান্য করে ভিন্ন পথে হাঁটে। তিনটি সাক্ষাৎকারে দুজনের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তার প্রতিটিই খাঁটি ও স্মরণীয় পলিফনিক ডায়ালগ।

দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে চরিত্র সম্পর্কে লেখকের বাচন এমন ভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে মনে হয় – "someone actually present, someone who hears him(the author),and is capable of answering him... In Dostoevsky's larger design, the character is a carrier of a fully valid word and not the mute, voiceless object of author's worlds. The author's design for a character is a design for discourse. Thus the author's discourse about a character is discourse about discourse."-(Problem's of Dostoevsky's Poetics, page 63) চরিত্র সম্পর্কে লেখকের পরিকল্পনা আসলে ডিসর্কোস বা বাচন সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা। আর সেই অর্থে চরিত্র সম্পর্কে লেখকের বাচন আসলে বক্তৃতা সম্পর্কে বক্তৃতা, বা ডিসকোর্স সম্পর্কে ডিসকোর্স। উপন্যাসের পরিকল্পনায় লেখক চরিত্র সম্পর্কে কথা বলেন না, চরিত্রের সঙ্গে কথা বলেন।

- মার্কেটপ্লেসের ভাষা(Language of Marketplace)

রাবলের 'গারগাঁতুয়া অ্যান্ড পাঁতাগ্রুয়েল' একটি বিস্ময়কর মধ্যযুগীয় রচনা। বাখতিন এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি পরীক্ষা করেছেন রাবলের ভাষার সেই সব উপাদানগুলি যেগুলি সপ্তদশ শতক থেকেই তার প্রশংসক ও পাঠকদের কাছে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। রূপকার্থে বলা যায় মার্কেটপ্লেসের এই সব ভাষা উপাদানগুলি অশ্লীল। এই ভাষা উপাদানগুলি ঊনবিংশ শতকে Abbe Perroud আর Abbe Marsy শোধন করার

চেষ্টা করেন। এই উপাদানগুলিই এখনও পাঠককে রাবলেকে বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

এমনকি আমাদের এই সময়ে দাঁড়িয়েও রাবলের উপন্যাসের অশ্লীল ভাষা তাকে সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য করে তোলে, এবং তার লেখা যে গড়পড়তা জনসাধারণের জন্য নয় সেকথাও বোঝা যায়। অমার্জিত শব্দকে শৈল্পিক রূপ দেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে এই পরিভাষাগুলি নির্দিষ্ট অর্থ অধিকার করে। পূর্বে এই পরিভাষাগুলি সর্বজনীন ছিল ও অশ্লীল রচনা থেকে দূরবর্তী ছিল। রাবলের Cynicism সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেখা যায় Veselovskyর রচনায়। তিনি রাবলে প্রসঙ্গে একটি হেলদি ভিলেজ বয় এর ইমেজ ব্যবহার করেন, যে ভিলেজ বয় তার ধোঁয়াটে কুটির থেকে খোলামেলা বাতাসে (spring air) বেরিয়ে আসে, পাগলের মত ছোটে একটা ডোবার কাছে । এক পথচারীকে মলিন করে কাদা ছুঁড়ে, ফূর্তিতে হেসে ওঠে যখন কাদার ডেলা পথচারীর হাতে, পায়ে, মুখে লেগে যায়, এক পাশবিক আনন্দ পায়।

বাখতিন দেখান যে এই ভিলেজ বয়ের ইমেজটা অসম্পূর্ণ। রাবলের cynicism শহুরে বাজার বা Marketplace এর অন্তর্গত। এটি ছেলেটির একক হর্ষ নয়, সামগ্রিক হর্ষ তাদের যারা মেলা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। এটা একটা জনপ্রিয় উৎসবের হর্ষ যেটা ধীরে ধীরে বহু শতক ধরে গঠিত হয়েছে। ভিলেজ বয় আসলে যৌবনের প্রতীক, অপরিণত মন ও অসম্পূর্ণতার প্রতীক। পথযাত্রীদের ভিলেজ বয়ের কাদা ছোঁড়ার রূপক আসলে আধুনিকতা থেকে অনেক দূরবর্তী। কলঙ্কিত করা এখানে হীন চরিত্র করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাবলের রচনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাখতিন প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখেছেন। রাবলের উপন্যাসে প্রস্রাবের প্লাবন

বয়ে যাওয়া খুব সাধারণ বিষয় রূপে বর্ণিত। তাঁর প্রথম বইয়ের জনপ্রিয় অধ্যায় যদি মনে করি যেখানে, Gargantua কৌতূহলী প্যারিসবাসী যারা তাকে দেখার জন্য ভিড় করেছিল তাদের দিকে প্রস্রাব ছুঁড়ে দেয়।

মলকে উপর দিকে ছোঁড়া এরকম ঘটনাও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই উদাহরণগুলিই প্রমাণ করে এগুলি হল প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হীন অঙ্গভঙ্গি। এই সব বর্ণনা অদ্ভুত বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শুধু নয় , প্রাচীনও। এই সব কার্নিভাল বা ভ্রাম্যমান আনন্দমেলার সংকেত ও চিত্রকল্প বুঝতে আমাদের এটা অনুধাবন করতে হবে যে এ সবই অঙ্গভঙ্গি, মৌখিক চিত্র যা আসলে কার্নিভালের অঙ্গ। হাসির বহমান নাটক– যা একাধারে জন্ম ও মৃত্যু কে উপস্থাপিত করেছে।

কার্নিভাল একটি খ্রীষ্টীয় উৎসব। 'লেন্টে'র আগে এই উৎসব পালিত হত। পরে কার্নিভাল জনপ্রিয় লোকউৎসবে পরিণত হয়। আমোদ প্রমোদ জমজমাট মেলার পরিবেশই সেখানে মুখ্য। রাবলে তাঁর সময়ের মার্কেটপ্লেস ও মেলার সঙ্গে সুপরিচিত। রাবলে তাঁর যৌবন কাটিয়েছেন এক মঠে সন্তদের সাথে। তিনি একাধারে যেমন গ্রীক সংস্কৃতি, মানবিকীবিদ্যা শেখেন, কিন্তু একই সাথে মার্কেটপ্লেসের জনপ্রিয় সংস্কৃতিকেও উপস্থাপিত করেন। সমগ্র ফ্রান্সে জনপ্রিয় ছিল এক মেলা যা বছরে তিনবার হত Fontenay-le-conta তে। যেখানে বহু ক্রেতা বিক্রেতা দেশ বিদেশ থেকে সমবেত হত। বহু জার্মানরা আসত এই মেলায়। রাবলে সেই মেলার জীবনকে প্রত্যক্ষ করে ভালো ভাবে এবং মানুষের কণ্ঠস্বরকেও। এরপরও রাবলে তার জীবনের নানা পর্যায়ে নানা স্থানে মেলা উৎসবকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। রোমান মেলায় প্রায়ই গালাগালি, নিন্দা, অভিশাপবর্ষণ চলত। এসবই ছিল তাদের কাছে আনন্দের অভিব্যক্তি, এটিকে তারা উপভোগ করত।

বাখতিন যে Menippean Satire এর কথা বলেন তার সঙ্গে মেলা উৎসবকে মিলিয়ে দেন তিনি, এই উৎসবের তিনটি স্তর, ভৌগোলিক বিশ্ব , নরক, পৃথিবী একাকার হয়ে যায়। পাতালে উচ্চ নিম্ন, ধনী দরিদ্র , সবার মধ্যেকার ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যায় , রাজা মুকুটহীন হয়ে পড়ে, আর সকলে তার সাথে এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় । সব সম্মান ধুলোয় মিশে যায় এমন এক ধারণা রয়েছে এখানে। কার্নিভাল আসলে ক্ষমতার বিপরীতে থাকা অবদমিত জনসত্তার প্রকাশের সুযোগ, এই কারণে বাখতিনের কার্নিভালের তত্ত্বটি রুশ সমাজতন্ত্রীদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। ‘মেনিপিয়ান স্যাটায়ার’ই তার কাছে সর্বাধিক কারনিভালাইজড সাহিত্যের উদাহরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ীর "জাগরী" - বাখতিনের তত্ত্বের আলোকে

যে কোন তত্ত্বের সার্থকতা তার প্রয়োগেই। তাত্ত্বিকদের আদি প্রস্তাবটি বিভিন্ন কৌণিকতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করেই সাহিত্য তত্ত্বগুলোর সত্যতা বিচার করা যায়। এখানে আমরা রাশিয়ান ভাষা তাত্ত্বিক ও শৈলী বিচারক মিখাইল বাখতিনের তত্ত্ববিশ্বকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে বেছে নেব, এবং খুঁজে দেখার চেষ্টা করব এর প্রায়োগিক দিকগুলো । প্রায়োগিক সাফল্য দেখার জন্য উপন্যাস হিসাবে বেছে নিতে পারি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' কে ।

১- Dialogic and Monologic pattern – *'Problems of dostoevesky's poetics' (1929)* বইতে বাখতিন উপন্যাসের দুটো ধরণ দেখান – monologic হল সেই রচনাগুলি যেগুলিতে লেখকের বাচন বা Authoritative Discourse যা অন্য সব চরিত্রের বাচন কে অধীনে রাখে , লেখকের একক কণ্ঠস্বর সেখানে প্রাধান্য পায় । তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে কোন সাহিত্যিক নির্মাণই সম্পূর্ণ monologic নয় । কিন্তু যে সব রচনায় চরিত্রের একক স্বরগুলি রচনাকারের উদ্দেশ্যের অধীন হয়ে পড়ে সেগুলিতে কেবল একটি স্বরের সত্যতা থেকে যায় –যা লেখকের নিজের।

এর বিপরীতে রয়েছে Dialogic pattern , যাতে বহু স্বর বা polyphony প্রতিষ্ঠা পায় । এখানে উপন্যাসের সকল চরিত্র নিজস্ব অবস্থান, শ্রেণি বা বর্গ থেকে বক্তব্য রাখে । সেই বক্তব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায় না লেখকের বক্তব্য।

২- Heteroglossia ও দ্বিবাচনিকতা- Polyphony-র সূত্র ধরে এসে পড়ে **Heteroglossia –র** প্রসঙ্গ। যেখানে বলা হয় ভিন্ন গোত্রীয় অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে রেখে না দেখলে কোন দেখাই সম্পূর্ণ নয় । জগত ও জীবন কে দেখার জন্য চাই ভিন্ন মেরুর অবস্থান – যা আনে অপরতার উপলব্ধি , এই ভাবেই সাহিত্যে আধিপত্যবাদী বর্গের বিপরীতে তৈরি হয়েছে নিম্নবর্গ, কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে নারীবাদী স্বর। দ্বি বাচনিকতা বা **dialogism** ভাষার একটি বিশেষ গুণ- যেখানে একটি উচ্চারণের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে অন্য কোন উচ্চারণ – কখনও প্রকট ভাবে , কখনও প্রচ্ছন্ন ভাবে রূপক বা ব্যঙ্গ-এর মধ্যে। যার ফলে সংলাপের নানা পরিসর তৈরি হয়।

Heteroglossia তে যেখানে একই সময় পরিধিতে একাধিক চরিত্রের ভাবনা , ইচ্ছা , আবেগের সমান্তরাল প্রতিফলন ঘটতে পারে। পলিফনি বা বহুস্বর হল নানা স্বরের একসঙ্গে অবস্থান । আর সমান্তরিত স্বরাগম শুধুই অনেক স্বরের একত্র অবস্থানের কথা বলে না, তাদের সমান্তরাল অবস্থানের কথাও বলে যাতে কোন স্বর অন্য স্বরকে অস্বীকার করতে পারে না। বাখতিন তাঁর **The Dialogic Imagination** এর অন্তর্গত 'Discourse in the Novel' প্রবন্ধে জানান হেটোরোগ্লাসিয়া ভাষার মধ্যে বিরোধের সূত্রেও আসতে পারে। সমাজে পেশা, শ্রেণী, বর্গ অনুযায়ী নানা ভাষা স্তর- উপন্যাসেও একে ব্যবহার করা হয়। আবার আত্মকথন সূত্রেও বহুস্বর তৈরি হয়। এই ভাবেই বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি ও আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় উপন্যাসের কাম্য পরিস্থিতি। বাখতিন জানান উপন্যাসে ত্রিমাত্রিক ভাষ্যের দ্বারা বহুস্বরের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে – ১ আত্মকথনে – যেখানে নিজের সাথে নিজের ভাবনার কথোপকথন, ২ অন্যের সাথে কথা বলার সময় – বিভিন্ন জনের কথা থেকে বিভিন্ন স্বর তৈরি হয় , ৩ বিশ্বের সাথে সংযোগ সূত্রে যা বলা হয় ।

৩ কার্নিভাল- 'Rabelais and his world' (1965) আর 'Problems of Dostoevsky's poetics' বই দুটিতে বাখতিন কার্নিভাল এর কথা জানান। ইউরোপীয় লোক সংস্কৃতির বিশেষ উৎসব কার্নিভাল । যা খেলা তামাশা আমোদ প্রমোদের সুযোগ করে দেয় । এখানে সব ক্রিয়াকলাপেই অনেকে অংশ নেয়। সামাজিক বৈভব বা সত্তার স্তর উল্টে যায়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে লোক সাধারণের মধ্যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক , ধর্মীয় ভীতি কে জয় করার উদ্দীপনা দেখা যায় – তাই এক অর্থে কার্নিভাল মানুষের মুক্তির প্রয়াস । সাহিত্যে এই প্রয়াস ঘটলে তা বাখতিনের ভাষায় হয়ে ওঠে কারনিভালাইজেশন। ষোল শতকের রাবলের রচনায় বাখতিন খুঁজে পান এক বিকল্প উপস্থাপন যেখানে সরকারি বা প্রচলিত রীতির বিরোধিতা করা হয়েছে। বাখতিন দেখান মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের জীবনে কার্নিভাল পরিস্থিতি ছিল অনেক প্রকট- সামন্ত্রতান্ত্রিক পরিবেশে রাষ্ট্র ও ধর্মতন্ত্রের শাসন একদিকে আর অন্য দিকে প্রতিষ্ঠানবিরোধী জীবনপ্রণালী যেখানে ছিল হাসি , গান , মজা , কৌতুক। এটা মূলত প্রান্তিক নিম্নবর্গের উৎসব- একপ্রকার মুক্তির প্রয়াস, সামন্ত্রতন্ত্র থেকে, শাসকের শৃঙ্খল থেকে। সাহিত্যে কার্নিভাল পরিস্থিতি কে ব্যবহার করাও এক প্রকার দ্বিবাচনিক প্রয়াস – যেহেতু ক্ষমতার বিপ্রতীপে একে স্থাপনা করা হয়। বহুজনের স্বর মিলে এখানে পলিফনি বা বহুস্বর তৈরি করে।

রাবলে তাঁর রচনায় মেলা পরিস্থিতিতে বীভৎস রসের আলাদা ভূমিকার কথাও জানান, বীভৎস বাস্তবতার সাথে মেলা পরিবেশকে মেলানো যায়। রাবেলের পাত্র পাত্রীরা ছিল বিচিত্র, উদ্ভট তাদের ক্রিয়াকলাপও ছিল অদ্ভুত। আসলে কার্নিভালের ভাবনায় রয়েছে নানান মুক্ত

পরিসর, সাহিত্যে এই মুক্ত পরিসর কে কাজে লাগিয়ে নানা নান্দনিক সম্ভাবনা তৈরি করা যায়, যেখানে থেকে যেতে পারে রাজনৈতিক অন্তঃস্বর ।

জাগরীর দ্বিবাচনিকতা নির্মাণ-

এবার আসা যাক 'জাগরী'র (১৯৪৫) কথায়- সতীনাথ ভাদুড়ীর এই জনপ্রিয় উপন্যাস সম্পর্কে কমবেশি সকলেই জানেন। এটি একটি রাজনৈতিক পরিবারের বিনিদ্র রাত্রি যাপনের কাহিনি, যেখানে পরিবারের বড় ছেলে বিলু ফাঁসি সেলের আসামী, '৪২ এর আগস্ট আন্দোলনে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি বিহার অঞ্চলে যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায় তাতে নেতৃত্ব দেওয়ায় ফাঁসির হুকুম হয় বিলুর- ফাঁসির আগের রাতে সেই চরম মুহূর্তকে কেন্দ্র করে পরিবারের চারজন বিলু-বাবা-মা-নীলু বর্তমান অনুষঙ্গে অতীত স্মৃতিচারণ করেন ও নিজেকে এবং অন্যকে বিশ্লেষণ করতে থাকেন, তাদের কথন ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বেশ কিছু সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে – সেগুলিকে বাখতিনের উপন্যাস তত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণ করলে উপন্যাসটিতে অভিনব প্রয়োগমাত্রা সংযোজন করা যাবে।

উপন্যাসের আদি কথক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলু তার বয়ানে নিজেকে দ্বৈতভাবে উন্মোচন করে – তার সত্তার নিজস্ব দ্বন্দ্বে যুগ্ম দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়েছে- যেমন যখন সে জেল সুপারিন্টেনডেন্ট কে তার কোন জিনিসের দরকার নেই জানিয়ে প্রাথমিক তৃপ্তি বোধ করে কিন্তু তার পরেই মনে প্রশ্ন জাগে –

" এক এক সময় নিজের উপর সন্দেহ হয় , হয়ত বা দেশের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা আমার নামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বেশি সজাগ।"(পৃষ্ঠা ১৩)

আবার তারপরেই মন ভিন্ন যুক্তিক্রম তৈরি করে- "সত্যিই কি তাই? একদিনের জন্যেও জীবনের স্থূল উপভোগের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিই নাই। দেশের জন্য যাহা ভাল মনে করিয়াছি তাহা করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই। ...। তাহার পরিবর্তে যদি চাই যে দেশের লোক আমার সম্বন্ধে দুই একটি প্রশংসাসূচক কথা বলুক, তাহা হইলে কি আমার আকাঙ্ক্ষা অন্যায্য?"(পৃষ্ঠা ১৪)

আবার বিলু যখন নিলুর আচরণের মূল্যায়ন করে, তার সংবেদনশীল মনের বিপরীতে নিলুর কাঠিন্যকে স্থাপনা করে তখন বিলুর বীক্ষণবিন্দু দিয়ে পাঠক নিলু কে চেনে। এখানেও একটি অপরতার দর্পণ তৈরি হয়। স্বর হয়ে ওঠে দ্বিবাচনিক – "সত্যই আমি জানি যে নীলু আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া নিজের কর্তব্য করিয়াছে। ... কিন্তু ইহা হইল যুক্তির কথা। সুপ্ত চেতনা হয়ত ভাবে যে এ যুক্তি কোর্টে চলিতে পারে , বই-এ ছাপার কালিতে ইহা দেখিতে ভাল, কিন্তু অন্যত্র ইহার স্থান নাই। ... নিজের পার্টির প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাইবার জন্য সহোদর ভাইয়ের ফাঁসির পথ সুগম করিয়া দেওয়া হৃদয়ের সততার প্রমাণ না রুগ্ন মনের শুচিবাইয়ের পরিচয়? বোধহয় নীলুর ব্যবহার আমার ভিতরের আসল আমি কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছি না; ..."(পৃষ্ঠা ৪৪)

রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব দেখা যায় বিলুর চেতনায় । জেলখানার ভিতর থেকে সে এক অন্য ভারতবর্ষকে দেখে, যে রাজবন্দীরা দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তারাই আবার জেলের ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, বিলু এর মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করে – যার ফলে অপরতার দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে এই রাজনৈতিক কর্মীদের দেখা দ্বিবাচনিক ভাবে সত্য হয়ে ওঠে -

" জেলের রাজবন্দীদের সময় কাটাইবার খোরাক চাই। যে অসীম কর্মপ্রেরণা জেলের বাহিরে থাকিতে তাহাদের সর্বদা চালিত করিয়া বেড়ায়, তাহারই তৃপ্তির জন্য তাহাদের জেলের মধ্যে নানা প্রকার জটলা দলাদলি ও পলিটিক্সের অবতারণা করতে হয়।" (পৃষ্ঠা ৩৮)

সর্বোপরি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিলুর চেতনায় যা সবচেয়ে বেশি দ্বিবাচনিকতা তৈরি করে তা হল জীবন সম্পর্কে বৈরাগ্য ও বাঁচার তীব্র ইচ্ছা। উপন্যাসের একেবারে শুরুতেই বিলু দেখে-

"দুই নম্বর ওয়ার্ডের অশ্বত্থ গাছটির উপরের শাখাটিতে গোধূলির ম্লান আলো চিক চিক করিতেছে। অনেকগুলি পাখি একবার এ ডালে একবার ও ডালে যাইতেছে। ... ... কিছুক্ষণের মধ্যেই তো চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকিয়া যাইবে। তাহার পর সারারাত নিঝুমের পালা; - তাই বোধ হয় শেষ মুহূর্তের এই চঞ্চলতা, এত ডানা ঝটপটানি, এত আনন্দ উৎসব – যতটুকু আনন্দ সময়ের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া যায়। (পৃষ্ঠা ৭)

একে শুধুই উপন্যাসের শুরুতে গোধূলির বর্ণনা ভাবলে ভুল হবে- এ আসন্ন মৃত্যুর দর্পণে প্রতিফলিত হওয়া বিলুর গভীর চেতনার রূপক ও মৃত্যুর অন্ধকার। যার জীবনে আর কিছুক্ষণের মধ্যে অনিবার্য মৃত্যু, জীবনের শেষ মুহূর্তের আনন্দটুকু সে খুঁজে নিতে চায় ওই পাখিদের ডানা ঝটপটানি, আনন্দ উৎসবের মধ্যে।

আবার যে বিলু নিরাসক্ত দৃষ্টিতে রাজবন্দী , কয়েদী , ওয়ার্ডারদের দেখে, জেল জীবন কে দেখে সেও আশা করে – যদি এই শেষ মুহূর্তে আমার ফাঁসি রদ করিবার হুকুম আসে ... আবার একথাও উচ্চারণ করে, সত্যি সত্যি ফাঁসির হুকুম হয়ে যাবার ফলে ভয়টা অনেক কমে গেছে । এই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন বিলুর আত্মকথনে ফিরে ফিরে আসে বার বার। - যা এক প্রকার স্বরের দ্বৈততা তৈরি করে।

এইভাবেই উপন্যাসের বাকি তিন জনের প্রতিবেদনেও ভিন্ন ভিন্ন অপরতার দর্পণ তৈরি হয়। আপার ডিভিশন ওয়ার্ডে বন্দী বাবার চেতনায় গান্ধিবাদী আদর্শের সঙ্গে পিতৃসত্তার আর্তি মিলে দ্বৈত স্বর তৈরি হয়। মায়ের বাচনে নারী স্বরের নির্মাণ , ভাষাও সেই জন্য আটপৌরে চলিত ভাষা । নিলুর নিজের প্রতিবেদনে তার ব্যক্তিসত্তার বিনির্মাণ – এতক্ষণ ধরে অন্যদের চোখ দিয়ে নিলুকে পাঠক যে ভাবে জেনেছে এখন নিলুর চেতনার গভীরতা থেকে তাকে অন্য ভাবে জানবার পালা।

বিলুর বাবার কথকতায় বিলুকে কেন্দ্র করে অপত্য স্নেহের এক ফল্গুধারা বয়ে যেতে দেখি। তার সাথে যুক্ত হয় নিজের রাজনৈতিক কর্মপন্থায় সংশয় — যেমন তৃতীয় শ্রেণির কয়েদি হিসাবে বিলুকে নানা রকম কষ্ট স্বীকার করতে হয় বলে তিনিও আপার ডিভিশনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে নিজেকে দূরে রাখেন- " তাহারই কথা মনে করিয়া , এইবার জেলে ফলমূল দুধ এসকল জিনিস খাই না, মশারি ফেলিয়া শুই না।"

আবার যখন নীলু বিলুর দলের সাথে নিজের দলের প্রতিতুলনা করেন- "নীলু বিলুদের দলের প্রোগ্রামের ভিত্তি, মানুষের মন আজ যেমন আছে তাহারই উপর ; আর আমাদের কার্যক্রমের ভিত্তি, হিংসা লোভহীন আদর্শ মানবমনের উপর। সেই জন্য সাধারণ লোককে উহাদের পথই আকর্ষণ করে বেশি ।"(পৃষ্ঠা ৮১)

বা " নীলু বিলুর কি পড়ার ঝোঁক। আর আমাদের পন্থার লোকেদের ? তাহাদের কথা আর বলিয়া কি হইবে ? আমি একখানি বই নিয়া বসিলেই বলে – মাষ্টারসাহেব আবার 'ইমতিহান' দিবেন নাকি? ... ইহাদের ধারণা যে গান্ধীজীর মতের উপর যাহাদের আস্থা আছে, তাহাদের আবার পড়াশুনা করিয়া নূতন জানিবার কি থাকিতে পারে ?" (পৃষ্ঠা ৮১)

বা যখন পিতা হিসাবে নিজের সমালোচনা করেন- " তবে আমার ও উহাদের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহার জন্য দায়ী আমি। কোনোদিন উহাদের সহিত প্রাণখোলা ভাবে মিশি নাই। কোলে পিঠে করিয়া আদর করি নাই। আমার ধারণা ছিল ছেলেদের সহিত বন্ধু ভাব স্থাপন করিলে উহাদের শাসন করা শক্ত।" (পৃষ্ঠা ৬৫)

আবার কখনও তাঁর চেতনায় ধরা দেয় নীলু বিলুর প্রতিতুলনা – " লঘু গুরুর জ্ঞান নীলুর ছোটবেলা হইতেই কম। এ বিষয়ে বিলুর সহিত তাহার আকাশ পাতাল তফাত।" বা যখন ভাবেন "হইতে পারে যে বিলুকে ইংরাজি কলেজে পড়াই নাই বলিয়া, উহার মধ্যে একটি inferiority complex আছে। নীলু কলেজে পড়িয়াছে, সেই জন্যই বোধহয়, নিলুর মনের মধ্যে এ ভাব নাই।" (পৃষ্ঠা ৬৪)

এবার আসা যাক মায়ের প্রতিবেদনে – প্রথমেই লক্ষণীয় অন্য তিনজনের প্রতিবেদনে যেখানে সাধু ভাষার প্রয়োগ, মায়ের প্রতিবেদনে অন্তেবাসী নারীবাদী স্বরকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই আটপৌরে চলিত ভাষার প্রয়োগ। মায়ের চোখ দিয়ে বিলু নীলুর ছেলেবেলা কে জানা যায় , রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে তাদের সত্তাকে উন্মোচন করে – ফলে দ্বিবাচনিক পরিবেশে তাদের চরিত্র পূর্ণতা পায়। মায়ের জবানিতেও বারবার বিলু নীলুর তুলনা, বিলুর প্রতি পক্ষপাত ধরা পড়ে, স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে গান্ধীবাদী আদর্শে দীক্ষিত স্বামীর চরিত্রেরও ত্রুটির দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে – যা চরিত্রটির দ্বিবাচনিক রূপকে দৃঢ় করে। যেমন - "আমাকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছিলে; আমি তোমার আশ্রমের হোটেলে দাসীবাঁদীরও অধম হয়ে চালিয়ে যাব চিরকাল- ... তোমার হুজুগ তোমার শখ গান্ধীজীর সেবা করা ; আমার কথা , ছেলেদের কথা একবার ভেবেছ ?" তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ – " তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য সব ছেড়েছ সত্যি, - কিন্তু আমাকে তো একটুও স্বাধীনতা দাওনি।" এছাড়াও সরস্বতীর সঙ্গে

বিলুর বিয়ের প্রস্তাব, বিলু নীলুর ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া, বারবার ওদের ছোটবেলা কেই মনে করা, সব মিলিয়ে মায়ের স্বরকে পুরোপুরি dialogic করে তুলেছে- কিন্তু বাকি দুই প্রতিবেদনের মত এখানেও বিলুর প্রতি পক্ষপাত লেখকের বিশেষ অভিপ্রায়ের দিকেই ইঙ্গিত করে।

সবশেষে রয়ে গেল জেল গেটে অপেক্ষারত নীলু- এতক্ষণ অন্যদের চোখ দিয়ে নীলুকে অসংবেদনশীল বলে জেনেছে পাঠক, এখন আত্মবিশ্লেষনের মধ্যে দিয়ে নীলু উপন্যাসে আর এক দ্বিবাচনিক পরিসর তৈরি করবে- দলের হয়ে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া নিয়ে তার নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব কাজ করেছে, নিজের মনেই নিজে বিপরীতধর্মী যুক্তিক্রম সাজিয়েছে, যাতে তার দাদার প্রাতি ভালোবাসা, টান আবার অভিযোগের সুরও ধরা পড়ে। যা একাধারে বিলুর সত্তায় দ্বিবাচনিকতা আরোপ করেছে, (বাবা, মা, বিলুর চোখ দিয়ে নিজেকে দেখার থেকে তা আলাদা) আবার নীলুর নিজের সত্তাকেও অপরতার দর্পণে আভাসিত করেছে। যেমন নীলু ভাবে- " কিন্তু ... কিন্তু দাদার কি আমার উপর কিছুই দাবি নেই ? থাকিতে পারে । থাকিতে পারে কেন, আছে। তাহার স্থান রাজনীতি ক্ষেত্রের বাহিরে। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি নীলু আর সে দাদা নয় । এখানে যে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া , যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রত্যেক কার্যপদ্ধতি যাচাই করিতে হইবে, আমার পার্টির দৃষ্টিকোণ দিয়া সকল ধর্ম বিচার করিতে হইবে, ...।" (পৃষ্ঠা ১৬৮)

আবার এই নিলুরই মনে হয় – "কিন্তু মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় নিজের রাজনীতিক principle একটু নমনীয় করিয়া লইলে কি লোকসান হইত?" (পৃষ্ঠা ১৫০)

বা বিলু সম্পর্কে সে মনে করে- "উহার আত্মকেন্দ্রিক মন চিন্তার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে চায়। সব প্রশ্ন সে নিজের ধরণে ভাবে, মনে মনে সব জিনিসের চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে, যে কোন সূক্ষ্ম বিষয় আমার অপেক্ষা ভাল বোঝে ; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনে, তাহার আচরণ যুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখে না।"(পৃষ্ঠা ১৬০)

এই ভাবে পুরো উপন্যাস জুড়ে দ্বিবাচনিকতার নানা রূপ প্রতিফলিত হয়। এবং উপন্যাস টি যে পুরোপুরি dialogic তাও বোঝা যায়। একটি চরিত্র যখন অন্য এক চরিত্রের কথাকে ব্যবহার করে তখন তার মতো করেই বলে। যেমন বিলু যখন তার মায়ের কথা মনে করে মায়ের বাচনকে অবিকল এক রাখে, এমন কি মায়ের উচ্চারণের ভুলটাও। "মা বলেন, 'দয়া দাক্ষিণাত্য'। আমি একদিন মাকে বলিয়াও দিয়াছিলাম- দয়াদাক্ষিণ্য বলিতে। মার দেখিয়াছি কথা বলিবার সময় এটি মনেই থাকে না।" (পৃষ্ঠা ১২)

কার্নিভাল প্রসঙ্গ জাগরীতে –

জাগরী-তে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোন কার্নিভাল পরিস্থিতি নেই, কারণ এটা অনেকাংশে চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস, কিন্তু ৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের সূত্র ধরে বিলু নিলুর চেতনায় ধরা পড়ে এক বিপ্লবের ছবি, যার মধ্যে নিহিত আছে এক বিশেষ ধরনের উল্লাস, যেমন – "মাইলের পর মাইল রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়াছে – লোহার রেল লাইন , ভারি ভারি রেলওয়ে স্লিপার, আরও কত জিনিস, দূরের নদীতে গিয়া ফেলিয়া আসিতেছে। টেলিগ্রাফের তার কাটা, পোস্ট অফিস ও মদের দোকান জ্বালানোর ভার গ্রামের বালকদের উপর। ... যেখানেই

তাহারা দল বাঁধিয়া যাইতেছে, সেখানেই তাহাদের সম্মুখে শক্তির স্তম্ভগুলি ভূমিসাৎ হইয়া যাইতেছে ও অত্যাচারের প্রতীক গুলি মাথা নত করিয়া লইতেছে।" (পৃষ্ঠা ১৮১)।

এখানে ক্ষমতার স্তর উল্টে যাচ্ছে , গতিবিধিও সম্মিলিত।

কিংবা, এই উদাহরণটি – "ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইল। ... । – স্টেশনে স্টেশনে চেয়ার, টেবিল, ঘড়ি, Station master's office লেখা সাইনবোর্ড, বড় বড় খাতা বই, একত্র জড়ো করিয়া জ্বালানো হইতেছে । ... একজন ছাত্র প্লাটফর্মের একটি আলো লইয়া 'রায়বেশে' নৃত্যের ভঙ্গিতে সকলের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে। " (পৃষ্ঠা ১৮১)

কিংবা নীলুর স্মৃতিতে যখন ধরা দেয় – দূরে বীরগাঁও স্টেশনের হাটে টমিগানের শব্দ হইতেছে- এদিকে ভুট্টার ক্ষেতে তাহার নকল করিয়া ছেলেরা স্টেশনের 'ফগ সিগনাল' গুলি ফুটাইতেছে। কেন করিতেছে তাহারা জানে না। হোলির দিন গ্রামসুদ্ধ লোক নেশা করিয়া যেইরূপ হইয়া যায় ইহারাও ঠিক সেইরূপ। নিলুর বয়ান থেকেই জানতে পারি এই অধীর উত্তেজনাকেই বিলুর দল বলে বিপ্লবের ড্রেস রিহার্সাল, - ক্রান্তির প্রচেষ্টা । এর সাথে মিল পাই বাখতিনের কার্নিভাল পরিস্থিতির – রাষ্ট্রীয় ভীতিকে জয় করবার , ক্ষমতার বিপ্রতীপে এক সম্মিলিত প্রয়াস, যার সাথে মিশে আছে এক ধরনের উল্লাস।

বিলুর চেতনা থেকে জেলের মধ্যে যে জটলা, দলাদলি, পলিটিক্সের কথা জানতে পারি সেখানেও যেন রয়ে যায় একপ্রকার কার্নিভালের আভাস। যে অসীম কর্মপ্রেরণা জেলের বাইরে তাদের সদা ব্যস্ত রাখত, তারই অভাবে রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে নিত্যনূতন প্রোগ্রাম খোঁজে, যেমন হঠাৎ তারা হুজুগ তোলে রোজ ভিজা ছোলা জলখাবারের পরিবর্তে চিড়া দিতে হবে, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ছড়া বাঁধা হয়ে যায় "চেঁনা-কা বদলে চূড়া লেঙ্গে"- জেলসুদ্ধ লোক সমস্বরে চিৎকার করে, থালা বাজানো শুরু হয়- "কেহ শিস দিতেছে; কেহবা দরজার গরাদগুলির উপর দিয়া

নিজের থালাখানি হড়হড় করিয়া টানিয়া যাইতেছে। তাহাতে একটি বিকট শব্দ হইতেছে। ... হঠাৎ যেন কোন যাদুদন্ডের স্পর্শে সকলে একসঙ্গে উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। যাহাদের অতি ধীর ও গম্ভীর বলিয়া জানিতাম, তাহারাও দেখি উৎসাহের আতিশয্যে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিতেছে না। কয়েকজন পাগলের মত ওয়ার্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 'কম্বল' ' কম্বল' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। তাহাদের কথায় অনেকে একটি নূতন প্রোগ্রাম পাইল। রাশি রাশি কম্বল দেখিতে দেখিতে কয়েকজন বাহিরে আনিয়া ফেলিল। কম্বলগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে। ... নিকটস্থ ওয়ার্ডার 'পাগলী' (alarm) হুইস্‌ল্‌ বাজাইতেছে।" (পৃষ্ঠা ৩৮) - সব মিলিয়ে জেলের আবহাওয়াকে যেন এক নতুন রূপ দেয়। এই প্রতিবাদ, কোলাহল এও যেন ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক উৎসব হয়ে দাঁড়ায়।

জাগরীতে Chronotope এর ধারণা-

বাখতিন ক্রনোটপের ধারণা উল্লেখ করেন তাঁর 'Dialogic imagination' গ্রন্থের 'Forms of Time and of the chronotope in the novel' প্রবন্ধে। গ্রিক শব্দ chromos-এর অর্থ সময় (time) আর topos-এর অর্থ স্থান (space). এই স্থান ও কালের ধারণা উপন্যাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রূপকথার শুরু হয় এক অনির্দিষ্ট স্থান কালের ইশারায়- কোন এক দেশে এক রাজা ছিল এমন ভাবে , কিন্তু বাখতিনের মতে উপন্যাস স্থান-কালের সূত্র ছাড়া তার তাৎপর্য হারায়। উপন্যাসের অর্থবোধ, বিচার, বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও কালের প্রেক্ষিতকে বিচার করতে হবে। আসলে স্থান কালের ধারণা উপন্যাসের সাথেই সম্পৃক্ত থাকে।

মানুষের যে কোন বাচনিক প্রকাশই স্থান ও কালের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখক ও পাঠকের ক্রনোটপের বোধ পরবর্তী সময়ের লেখকের ক্রনোটপের বোধকেও অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করে বা প্রসারিত করে। লেখক তাঁর ক্রনোটপকে অতীত বা তাঁর সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নতুন পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসে স্থাপনা করেন। পাঠক আবার তাকে তার সময়ের চাহিদা অনুযায়ী জারিত করে নেয়। এইভাবে স্থান ও কালের এক অপূর্ব চলন তৈরি হয়। Time আর Space-এর এই আশ্চর্য চলন লক্ষ্য করা যায় সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' তেও। এখানে আকর্ষণীয়ভাবে কাহিনির প্রতিটি চরিত্র নিজ নিজ কথা বলার সময় পরিধি ও ঘটনার পটভূমিকে তুলে ধরেছেন। সন্ধ্যাবেলা থেকে প্রত্যেকের চিন্তাপ্রক্রিয়া ও আত্মকথন শুরু হয়, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে তারা অতীতচারী হয়েছেন, এমন কি পৌঁছে গেছেন শৈশব অব্দি। আবার প্রয়োজন অনুযায়ী রাজনৈতিক অনুষঙ্গ এসেছে অপরিহার্যভাবে, ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন যা আগস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত, এই উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে উপস্থিত।

এতএব বিশেষ রাজনৈতিক সময় আর কথকদের আত্মকথনের সময় বা চিন্তাপ্রক্রিয়ার সময় (সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত) এবং অতীতকাল এখানে মিলেমিশে সময়ের এক বিশেষ চলন তৈরি করে। আর স্থান পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেলের বিভিন্ন ওয়ার্ড যেখানে বসে কথকরা তাদের চিন্তাপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু সেই স্থান স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে কখনও অতীতচারী, কখনও কোন বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনার ইঙ্গিতবাহী। পাঠক এই ক্রনোটপে নিজেকে জারিত করে, ৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের সময়কার বিভিন্ন দলের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বুঝতে পারে। যেমন উপন্যাসের শুরুর সময়টা প্রথমেই নির্দিষ্ট করা হয়—

"দুই নম্বর ওয়ার্ডের অশ্বত্থ গাছটির উপরের শাখাটিতে গোধূলির ম্লান আলো চিক-চিক করিতেছে। অনেকগুলি পাখি একবার এ ডালে একবার ও ডালে যাইতেছে। এক দণ্ডও বিশ্রাম নেই।" (পৃষ্ঠা ৭)

- অর্থাৎ গোধূলির ম্লান আলো সন্ধ্যার আসন্নতাকে দ্যোতিত করে।

আবার হঠাৎ করেই বিলুর মনে পড়ে –

"সেই একবার বকড়ীকোলে মিটিং করিয়া ফিরিবার সময় কামাখ্যাথানের বিরাট বটগাছের নিচে আমাদের সারারাত থাকিতে হইয়াছিল।" (পৃষ্ঠা ৭) –

এখানে বিলুর অতীতচারী মন তাকে নিয়ে যাচ্ছে তার রাজনৈতিক সক্রিয়তার দিনগুলিতে।

আবার যখন সে ভাবে- "আর এই বিরাট পূর্ণিয়া সেন্ট্রাল জেল শহর হইতে কম কিসে? সাধারণ সময় থাকে প্রায় পঁচিশ শত কয়েদী। আর এখন ১৯৪৩ সালের মে মাসে আছে সাড়ে চার হাজার।" (পৃষ্ঠা ৯) - একেবারে উপন্যাসের বর্তমান সময়টা, বিলুদের জেলবন্দী অবস্থানের সময়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বারবার অতীতের, শৈশবের স্মৃতিচারণের দৃশ্য তো আছেই। এই ভাবেই সমগ্র উপন্যাসে চারজনের কথনেই কমবেশি ক্রনোটপের পরিসর দেখা যায়।

শৈল্পিক বিচারে উপন্যাসের কথন শৈলীতে দ্বিবাচনিকতার প্রাধান্য দেখা যায়, তবে শুধু ভাষার সংগঠন বা রূপ-এর ক্ষেত্রে নয়, ভাষার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নির্ণয়-এর মাধ্যমে এখানে সমাজকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে – আর এখানেই বাখতিনের তত্ত্বে যে রুশ রূপবাদ ও মার্কসবাদের সমন্বয়ের কথা শোনা যায়, তারও যেন আভাস পাওয়া গেল। রুশ রূপবাদী

আন্দোলন একটি সাহিত্যিক আন্দোলন যা রুশ বিপ্লবের দু-এক বছর আগে আরম্ভ হয়। গঠনবাদের বক্তব্যের সঙ্গে এর কার্য পদ্ধতি ও মতবাদের মিল পাওয়া যায়। বাখতিন তাঁর বিখ্যাত বই 'Rabelais and his world'-এ রূপবাদ ও গঠনবাদের সাদৃশ্যকে দেখান- রূপবাদীরা সাহিত্যের অনুশীলন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে করতে চাইলেন। রূপবাদী সাহিত্যে ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি কে উপেক্ষা করে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় জোর দেওয়া হয়। বাখতিন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সাহিত্যে সামাজিক দায়িত্বের দিকটি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে রূপবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা করেন। বাখতিন এখানে মূলত দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন- ১ প্রতিটি উচ্চারণ মূলত সামাজিক, ২ অপরতার দর্পণে প্রতিফলিত না হলে কোন অস্তিত্বই সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং সংলাপের ভিত্তিতে আমাদের যে জগত গড়ে ওঠে সেখানে একে অপরের কাছে জগত ও জীবনের তাৎপর্য, বিনিময়ের মাধ্যমে সত্তার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। সেই দিক থেকে বাখতিন তত্ত্বের আলোকে জাগরীর আখ্যানরীতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখি, গঠনবাদের দিক থেকে- এখানে চারজন কথকের যৌগিক আত্মকথন রীতিতে প্রত্যেকের চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন অপরতার দ্বারা দ্বিবাচনিক পরিসর তৈরি হয়েছে, একজনের বাচন অন্য জনের চরিত্র নির্মাণকে সম্পূর্ণ করেছে । আবার রচনায় সামাজিক পরিসরের দিকটিকেও অস্বীকার করা যায় না, জেল এখানে সমগ্র ভারতবর্ষের রূপক, জেলে রাজনৈতিক কর্মীদের দলাদলি, স্বার্থপরতা, ৪২ এর আগস্ট আন্দোলনের রূপ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্তঃসারশূন্যতার দিক সব মিলিয়ে উপন্যাসটি যে বিশেষ একটি সময়ের সামাজিক স্বর কে নির্মাণ করছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

বাখতিনের তত্ত্বের নিরিখে – ঢোঁড়াই চরিত মানস

দ্বি বাচনিকতার পরিসর – ঢোঁড়াই চরিত মানসে

বাখতিনের উপন্যাস তত্ত্বে দ্বিবাচনিকতা নিছক কোন ধারণা নয়, তা সমগ্র উপন্যাস তত্ত্বের সাথে জড়িত, যেখানে সত্তার উপলব্ধি কেবলমাত্র একক দর্পণে সম্ভব নয়, তার জন্য ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি নানা অপরতার দর্পণ নির্মিত হয়, এগুলিতে প্রতিফলিত হয়েই উপন্যাস ও তার চরিত্রগুলি পূর্ণতা পায়। মানবসত্তার মূল স্বরূপ দ্বিবাচনিক –আমরা অনবরত সম্পর্ক গড়ে তুলি, আবার ভাঙি – নতুন করে গড়ে তুলব বলে। এই ভাবেই বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পুনর্নির্মাণ-এর দিকে এগিয়ে যায়।

বাখতিনের মতে সময় ও ইতিহাস কে নির্মাণ করতে উপন্যাস একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, উপন্যাস তার কাছে শুধুই বাচনিক বা ভাষিক ক্রিয়াকলাপ নয়। এখানেই তার তত্ত্বে রুশ রূপবাদের অবয়ববাদী ধারনা ও মার্কসীয় সমাজতাত্ত্বিক ধারনার সমন্বয় দেখা যায়। তাঁর সমসাময়িক মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচক জর্জ লুকাচের প্রস্তাবনা অনুযায়ী – উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পাঠক একটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্ভুল, অনুপুঙ্খ বিবরণ পায়, বাখতিন এখানেই অনন্য, তিনি ইতিহাস, সমাজতত্ত্বের সঙ্গে উপন্যাসের সংরূপগত ভিন্নতা বিষয়ে সচেতন । তাই তিনি অবয়ববাদীদের মতো উপন্যাসের উপস্থাপনে ইতিহাসকে কেটে ছেঁটে বাদ দেননি ঠিকই কিন্তু উপন্যাসকে হুবহু ইতিহাসের প্রতিবেদন করে তোলেননি।

এছাড়াও বাখতিনের মতে উপন্যাসের চরিত্ররা সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবকে ধারণ করে, সমাজ ও ইতিহাস তাকে কিছুটা হলেও নির্মাণ করে, তাই সেই অর্থে তারা typical চরিত্র হলেও চরিত্রের বাস্তবতা কখনই সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতেই শেষ হয়ে যায় না – তারপরেও ব্যক্তির মধ্যে স্বতন্ত্র অনেক কিছুই পড়ে থাকে, যেখানে চরিত্রগুলির একান্ত নিজস্ব মানবিক কিছু সম্ভাবনা প্রকাশ পায়।

এই আলোচনার ভিত্তিতে যদি "ঢোঁড়াই চরিত মানস"-এর দ্বিবাচনিক পরিসরকে দেখি এখানেও ইতিহাস ও সমাজ গুরুত্ব পেয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে নানান সমকালীন ও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে – এগুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নির্মাণ করছে ঢোঁড়াইকে। আবার ঢোঁড়াই ও এইসব ঘটনার অভিঘাতে বিবর্তিত হয়ে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি থেকে ধীরে ধীরে এক রাজনীতি সচেতন চরিত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সব কিছুর পরেও ঢোঁড়াই যে কেবলমাত্র typical চরিত্র হয়ে থেকে যায় না, তার প্রমাণ রাজনীতির আবর্তকে ছাড়িয়ে ব্যক্তি জীবনে ফিরে আসার আমোঘ আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়।

উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১৯১২-১৯৪২ এর সমকালীন নানা রাজনীতির প্রবাহ দেখা যায়, কিন্তু রাজনীতির ধারাবিবরণী দেওয়ার জন্য তো উপন্যাস লেখেননি সতীনাথ। রাজনীতিকে এখানে নিম্নবর্গীয় চেতনার সঙ্গে, উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি।

উপন্যাসের শুরুতে সুকৌশলে ঢোঁড়াই-এর জন্ম সালটা জানান লেখক, সময়টা ১৯১২। কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, সেই উপলক্ষ্যে উৎসব- বাদ যায় না জিরানিয়া টাউন, ঢোঁড়াইয়ের বাপ দরবারে 'জুলুষ' দেখতে যায়।

আবার ঢোঁড়াই যখন বছর দেড়েকের ১৯১৩ সালে, পূর্ণিয়া জেলার তৎকালীন জেলাশাসক কিলবি সাহেব প্রথম মোটরগাড়ি নিয়ে আসেন ওই অঞ্চলে। উপন্যাস আনুযায়ী ঢোঁড়াইয়ের বাপও আর পাঁচজনের সাথে জ্বর গায়েই হাওয়া গাড়ি দেখতে যায়। ফিরে এসে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে ও দিন কয়েকের মধ্যে মারা যায়, সুতরাং ঢোঁড়াই পিতৃহারা হয় সেই বছরই।

এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনারই অনুপুঙ্খ বিবরণ লেখক কোথাও দেন না , কারণ তার উদ্দেশ্য ইতিহাস নির্মাণ নয়, কেবলমাত্র ঢোঁড়াইয়ের জীবনের ক্রমবর্ধমান পথপ্রবাহের সাথে ইতিহাসের সমকালটার সংযোগটুকুকে বুঝিয়ে দেওয়া।

১৯১৯-১৯২০ নাগাদ দেশে হরতাল ও মাদকদ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়, সেইসময় অসুখ করে ঢোঁড়াইয়ের । রেবনগুণী বুধনীকে এই ব্যাধি মুক্তির উপায় বলে দেয়, তার মুখে শোনা যায় –

“ কালই তো শনিবার। কাল আসিস। কাল তো আবার হাড়তাল না কী বলে, ওই কী একটা নতুন হয়েছে না আজকাল, গতবছরেও হয়েছিল একবার- দিনের বেলা সওদা মিলবে না, সাঁঝের পরে দোকান খুলবে, কাল আবার তাই আছে।” (ঢোঁড়াই চরিত মানস , পৃষ্ঠা ১৯)

প্রায় এর সমসাময়িক সময়ে বিহারে লোকগণনা (আদম শুমারি) হয়। তাৎমাদের বিশ্বাস এর ফল ভালো হবে না । তাৎমাদের বিশ্বাস, নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোর সংস্কারী মনের সাথে কৌশলে ইতিহাসের সময়কালকেও ছুঁয়ে যান লেখক।

বটোহীর গানের প্রসঙ্গ - এ গান ছিল পথিকদের উদ্দেশ্যে, হরতাল শুরু হবার পরই রামসীতার গানের থেকে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়, যে গানে ছিল মাটির কথা, স্বদেশের বর্ণনা, আর গানের শেষে ‘রে বটোহীয়া’ জুড়ে দেওয়া হত। নির্দিষ্ট সময়ের চিহ্নায়ক এই গান।

১৯৩০ এর গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহের ডাক উপন্যাসে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তা পরোক্ষভাবে নায়ক ঢোঁড়াই-এর প্রতিবাদী সত্তাকে জাগরণের পথে কিছুটা এগিয়ে দেয়। ভারতের প্রায় সকল জায়গা এই আন্দোলনে সাড়া দেয়, উত্তর বিহার, চম্পারণ, মজঃফরপুর, ভাগলপুর , পূর্ণিয়ার মানুষরা বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, যার ঢেউ এসে পৌঁছায় তাৎমাটুলিতে। 'গানহী বাওয়ার ভিন্ন মূর্তিতে পুনরাবির্ভাব' অধ্যায়ে দেখা যায় জমি সার্ভে হওয়ার সময় বকরহাট্টার মাঠ জমিদার কৌশলে নিজের সম্পত্তি করে নিয়েছে। তাই সেখানে মহাত্মাজীর থান হতে সে দেবে না কিছুতেই। 'পিদিম' জ্বালাতে দেবে না, - তাই হাজির হয়েছে পুলিশ, সঙ্গে হাকিমও। তাদের বক্তব্য –

" রোজগার কর, খাও দাও থাক। না হলে ফল ভুগবে। তোমাদের কিছু বলার থাকে তো আমার কাছে যখন ইচ্ছা বলতে পার, কিন্তু কংগ্রেসের লোকেদের পাল্লায় পড়েছ কি, তোমাদের সব কটাকে ধরে জেলে দেব।" (পৃষ্ঠা ১০৭)

সকলের মন তখন ভয়ে কেঁপে ওঠে, মহাত্মাজীর চেলারা, মাস্টারসাহেবের চেলারা তা হলে কংগ্রেসের লোক। ঠিক এই সময়ই –

"ঢোঁড়াই হাকিমকে সেলাম করে বলে হুজুর মা বাপ। আপনার কাছে আমাদের একটা আর্জি আছে। আমাদের চৌকিদার ট্যাকস্ বসাতে তশীলদার সাহেব বেইমানি করেছে ; রবিয়ারও বারো আনা, বাবুলাল চাপরাসীও বারো আনা। তা কি করে হয় ? সকলে অবাক হয়ে যায়

ঢোঁড়াইয়ের সাহসে। হাকিমের সঙ্গে কথা বলেছে; দারোগার সম্মুখে ; আবার তশীলদার সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ। এই বুঝি হাকিম তাকে তাড়া দিয়ে ওঠেন।" (পৃষ্ঠা – ১০৭)

এখানে ইতিহাস পরোক্ষ ভাবে নির্মাণ করছে ঢোঁড়াইয়ের প্রতিবাদী সত্তাকে। ১৯৩০-এর উত্তাল সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে ঢোঁড়াই সরকারের প্রতিনিধির কাছে নিজের দাবি জানাচ্ছে নির্ভীকভাবে। শুধু তাই নয় , আর একটা বিষয়ও কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মহাত্মাজীর আহ্বান মানুষের মন থেকে মুছে যাবার নয় , যতই ইংরেজ পুলিশ ভয় দেখাক না কেন।

শুধু তাই নয় মরণাধারের কাছে মহাত্মাজীর নতুন থান হবার সংবাদে সবাই ছুটে যায়, ঢোঁড়াই ও রামিয়াও যোগ দেয় তাতে। এতে বৌকাবাওয়া ভয় পায় ঐখানে গানহী বাওয়ার নতুন থান হলে তার থানের মাহাত্ম্য কমে যেতে পারে। - " বাওয়া ভাবে যে সত্যি যদি ওখানে আর একটা থান হয়ে যায়; তা হলে তাৎমাটুলিতে গোঁসাইথানের গুরুত্বতেও কিছুটা টান পড়তে পারে।" (পৃষ্ঠা ১০৫)

হয়তো এই ঘটনাই পরোক্ষ ভাবে বৌকাবাওয়ার ঢোঁড়াই কে ছেড়ে চলে যাবার ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে – এই ঐতিহাসিক সময়ের অভিঘাতেই তার এতদিনের সবচেয়ে নিরাপদ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিয়ে করে ঢোঁড়াই বাওয়ার থেকে অনেকটা দূর হয়ে যায় তা বাওয়াকে খুবই মানসিক যন্ত্রণা দেয়।

এরপর চলে আসি উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে – এখানে চিরতরে তাৎমাটুলি ত্যাগ করে ঢোঁড়াই পৌঁছেছে বিসকান্ধায়, সেখানে কোয়েরি জাতের মানুষদের বাস, যাদের বংশানুক্রমিক পেশা চাষবাস। এখানে এসে ঢোঁড়াই আশ্রয় পায় মোস্মমত ও তার মেয়ে সাগিয়ার কাছে। তাদের তামাক ক্ষেতে কাজ জুটে যায় । প্রথম চরণের তুলনায় দ্বিতীয় চরণে অনেক বেশি করে

এসেছে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রবাহ, কারণ তাৎমাটুলির থেকে অনেক বড় জায়গা বিসকান্ধা – তাই এখানে বড় গ্রামে অনেক দল, তাদের অনেক রকম স্বার্থ।

জমি জিরেত নিয়ে রাজপুত জমিদার আর কোয়েরি আধিয়ারদের মধ্যে গন্ডগোল লেগেই থাকে, ঢোঁড়াই আসার পর সেই বিরোধ আরও বড় আকার ধারণ করে আর সেই সূত্রেই ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বদানকারী সত্তার প্রকাশ ঘটে। রাজনীতি না বোঝা ঢোঁড়াই রাজনৈতিক আর্বতে ঢুকে পড়ে – এখানে রাজনীতি তাকে নির্মাণ করছে নতুন ভাবে, আবার সেও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে গিয়ে (রাজপুত জমিদার) রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে- এই ভাবেই দ্বিবাচনিকতার পরিসর তৈরি হচ্ছে।

'মধুবনে শান্তিভঙ্গ' অধ্যায়ে দেখি ঢোঁড়াইয়ের সেই প্রতিবাদী রূপ, বাবুসাহেবের কাছ থেকে ধান চেয়ে নেবার অনুষঙ্গে – সে কোয়েরিদের জানায় – "দারোগা, হাকিম, চৌকিদার যখন বাবুসাহেবের খেলাপে, তখন আর ভয়ের কী আছে?" আর বাবুসাহেবকে সে সাহসের সঙ্গেই জানায় –

" আমরা এসেছি ধান নিতে" , " ঢোঁড়াই গোলার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে আমরা গোলা থেকে মেপে ধান বার করে নিচ্ছি । এক ছটাক ধানও এদিক ওদিক হবে না।" (পৃষ্ঠা ১৪৯)

এরপর থেকেই কোয়েরি ও বাবুসাহেবের মধ্যে লড়াইটা জমল ভালোই , বাবুসাহেব ভাবতে থাকে –

" এ হল কী কালে কালে। ইংরাজের রাজত্ব আবার চলে গেল নাকি, মহাৎমাজীর দু ফোঁটা নুনের ছিটেতেই।"(পৃষ্ঠা ১৫০)

তার ধারণা মহাৎমাজীর চেলারাই মাথায় চড়িয়েছে এদের। কোয়েরীরা লক্ষ্য করল এরপর থেকেই রাজপুতদের গরু, মোষ, ঘোড়া খেয়ে যাচ্ছে তাদের ফসল, কোয়েরিদের ভিতরেও ক্ষোভ বেড়ে উঠল- "কোয়েরীরাও বসে থাকে না। রাজপুতদের মাটিতে কাটা লোহার দাগ মুছে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াইতে।" (পৃষ্ঠা ১৫৩)

ক্ষোভ বোধ হয় জমে ওঠে ধরিত্রী মায়ের বুকের ভেতরেও। গমগম, গুড়গুড় শব্দে হুঙ্কার ছাড়ে যেন পৃথিবী, তামাক খেতের মধ্যে জমিটা ফেটে যায়, ফোয়ারা দিয়ে বাতাস সমান উঁচু জল আর বালি বেরোয়, ফাটলের মধ্য দিয়ে। লেখক এখানে ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি সমগ্র বিহার জুড়ে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় তার কথাই জানান। এই ভূমিকম্পের ফলে সামগ্রিক জনজীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই সময় সাধারণের পাশে দাঁড়াবার জন্য ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সহ বহু বন্দী কংগ্রেস কর্মীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ঢোঁড়াই এই সময় কুয়ো থেকে বালি তোলবার কাজে লেগে যায় , বিল্টা ও অন্যান্যরাও তার সঙ্গে এসে যোগ দেয়। তাৎমা হিসাবে ঢোঁড়াই এই কাজে পারদর্শী আর তাই এই কাজ করতে গিয়ে সে কংগ্রেসি ভলেন্টিয়ার বা নেতাদের সুনজরে পড়ে। লাডলীবাবু পর্যন্ত এসে পিঠ ঠুকে তার তারিফ করে এবং সব কুয়ো থেকে বালি তোলার কাজ তাকে ও তার দলকে দেবে বলে জানায়। আরও জানা যায় স্বয়ং মহাৎমাজী আসছেন জিরানিয়ায়, ভূমিকম্পে মুলুকের লোকসান দেখতে। তিনি এসে অনেক কিছুই বলেন, ঢোঁড়াই তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে, মহাৎমাজীর কথা নিজে কানে শুনতে পাওয়াকেও সৌভাগ্য মনে করে। মহাৎমাজী বলেন –

" 'পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাই জন্যই দেশে এই ভূমিকম্প হয়েছে।' ... 'অছুৎ হরিজনদের উপর আমরা অন্যায় করি। তাদের মানুষ বলে ভাবি না। ধরতিমাই সে পাপের বোঝা সইতে পারেন নি।" (পৃষ্ঠা ১৭২)

“কথাটা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না। রাজপুতদের পাপের কথা কি তা হলে ভুল? তাৎমাতুলির মোড়লদের পাপের কি তা তাহলে কোন ওজন নেই।” (পৃষ্ঠা ১৭২)

– এখানে পাপের প্রসঙ্গে ঢোঁড়াই যে নিজের মতো করে বুঝছে রাজনীতি কে, সমাজকে তা বোঝা গেল, মহাৎমাজী অছুৎ হরিজনদের উপর অন্যায়টা দেখেন কিন্তু রাজপুতদের মোড়লদের পাপ তার অজানাই থেকে যায়, কিন্তু প্রতিবাদী ঢোঁড়াই-এর মনকে তা নাড়া দেয়। এই ভাবে রাজনীতিও ঢোঁড়াই কে নির্মান করে, তার নিজস্ব ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই রকম টুকরো টুকরো ঘটনা ঢোঁড়াইকে নিম্নবর্গের এক সাধারণ মানুষ থেকে রাজনীতি সমাজ সচেতন এক ব্যক্তিত্ব করে তুলেছে। এই নির্মানের পথে ঢোঁড়াই এর আরও এক বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়, এই অভিজ্ঞতা কোথাও স্বয়ং লেখক সতীনাথেরও অভিজ্ঞতা। ‘সাচ্চালোক’ লাডলীবাবুর রিপোর্টের ভরসায় থেকে থেকে বছর ঘুরে গেল তবুও রিলিফ এল না। মহাত্মাজির কথা মহাত্মাজির দলের লোকেরাই ব্যর্থ করে দেয়, তা চোখের সামনে দেখেও ঢোঁড়াই পুরোটা অনুভব করে না , পুরোপুরি সচেতনতা তখনও তার তৈরি হয়নি , সে তখনও তার হয়ে ওঠার পথে।

রাজনীতি ঢোঁড়াইকে নির্মাণ করে, আর ঢোঁড়াই এর সূত্রে পাঠকও জানতে পারে বাবুসাহেবের রাজনীতিকে, নিচু জাতগুলির নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিজের জয়ের পথ পরিষ্কার করে নেয় সে। কোয়েরিদের জমি সাঁওতালদের জোর করে পাইয়ে দেন তিনি, এই রকম এক উত্তপ্ত সময়ে গ্রামে আসে ‘বলন্টিয়র’ বাবুদের দল’, এদের মুখেই প্রথম বিস্কান্ধার মানুষ শোনে ভোট বা ‘বোট’ কথাটা, যার অর্থ এরা ভালো করে বোঝে না , এরা শুধু বোঝে একদিকে মহাত্মাজির লোকেরা আর অন্যদিকে বাবুসাহেব, রাজপুত, দারোগা, গিধর মণ্ডলের লোকেরা।

এই ভলেন্টিয়ারদের সুনজরে পড়ে ঢোঁড়াই। ১৯৩৭-এর বিহারের আইনসভার নির্বাচনের কথা আছে এখানে। এই সূত্রেই ঢোঁড়াই প্রথম শোনে 'ভোট' কথাটা। এবং সে দেখল ভোট করাতে আসা ভলেন্টিয়াররা তাকে 'আপনি' সম্বোধন করছে, এই ভাবেই ধীরে ধীরে সে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি হয়ে ওঠে। মহাত্মাজীর চিঠি পেয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে যায় সে।

" ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে প্রণাম করে ঢোঁড়াই চিঠিখানা তার মধ্যে ফেলে। ধন্য হো মহাৎমাজী, ধন্য হো কাংগ্রিসের বলন্টিয়ার, যাদের দয়ায় নগণ্য রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেড়ালীর কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল।" (পৃষ্ঠা ১৮৯)

এরপর মানুষের অধিকার রক্ষার নানা রকম কথা শোনে সে , জানতে পারে বারো

বছরের উপর দখল থাকলে আধিয়ারদের কিছুতেই সরাতে পারবে না বাবুসাহেব। নতুন কানুন অনুযায়ী ফসলের আঠারো সের জমিদারের, বাইশ সের আধিয়ারের। এইসব কথায় তার কেমন যেন ঘোর লেগে যায়, তাও সব ঠিক করে সে বুঝতে পারে না , কোথাও যেন একটা ব্যবধান থেকেই যায়। এরপরও ইতিহাস ঢোঁড়াই কে নির্মাণ করে চলে। ১৯৪১ এরম সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আভাস ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে গ্রামে, ঢোঁড়াই দেখে পাক্কীর পথ দিয়ে দিনরাত চলেছে ফৌজি গাড়ি, তার আশঙ্কা হয় তার চেনা পাক্কীও বুঝি বদলে গেল। কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে গান্ধিজি ডাক দিয়েছিলেন অহিংস সত্যাগ্রহের, সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল 'সতিয়াগিরা' বা সত্যাগ্রহ, যার থেকে বাদ পড়েনি ঢোঁড়াইদের কোয়েরিটোলা, ঢোড়াইয়ের উপর আসে নানা কাজের দায়িত্ব। ঢোঁড়াই ও এখানে নিজের মত করে রাজনীতিকে বুঝে নিতে শেখে-

" ঢোঁড়াই তিনটে কথা বোঝে মহাত্মাজি চান সকলে সত্যি কথা বলুক; সকলে বৈষ্ণব হয়ে থাক; আর দারোগার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় বলন্টিয়ারজী কিছুতেই চটবে না।"(পৃষ্ঠা ২০৭)

" আর বোঝে যে, মহাত্মাজী দারোগাসাহেবের উপর রাগ করতে বারণ করেছেন বলন্টিয়ারকে, কিন্তু ঢোঁড়াইদের উপর চটে উঠতে মানা করেননি।"(পৃষ্ঠা ২০৭)

রাজনীতি অনেকটাই সচেতন করে তোলে ঢোঁড়াইকে। মহাত্মাজীর আদর্শের ভেতরের ত্রুটি চোখে পড়ে ।

দিন দ্রুত বদলায় , চেনা দেশটাও কেমন অচেনা লাগে ঢোঁড়াইয়ের। ১৯৪২ সারা দেশ জুড়ে 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। মহাত্মাজী ও কংগ্রেস কর্মচারীরা গ্রেপ্তার হলে ঢোঁড়াইরা অঙ্গীকার করে – "মহাত্মাজী গ্রেপ্তার! হো যাও তৈয়ার।" দুনিয়াতে রামরাজ্য আনার জন্য মহাত্মাজীর শেষ লড়াই এটা। ঢোঁড়াই দেখে –

" এবার আর আগের মত নিমক তৈরীর ফিস্ -স্-স্ আর সতিয়াগিরার ফুস্-স্-স্ নয়। ...। এবার মরদের লড়াই রেললাইন তুলবার, তার কাটবার আরও অনেক! অনেক!" (পৃষ্ঠা ২১৪)

ঢোঁড়াইরা উত্তেজনার বশে তিতলি কুঠি দহন করে। দেশ জুড়ে সরকারী দমন নীতি চলে, হাজারীবাগ জেলে বসে কয়েকজন নতুন ভাবে স্বাধীনতার চিন্তা করে, সেখান থেকেই নতুন দল তৈরি হয়, 'আজাদ দস্তা' নামে। ঢোঁড়াই এই আজাদ দস্তায় প্রবেশ করেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসে। এখানে এসেই তার অক্ষরজ্ঞান হয় , নতুন নাম হয় রামায়ণজী। এতদিন যে রাজনীতিকে দূর থেকে দেখেছে তাকে এবার কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় তার। শুরু হয় তার আসল রাজনীতির পাঠ। এইভাবেই ঢোঁড়াই কে ইতিহাস, রাজনীতি নির্মান করে এক

নিম্নবর্গের মানুষ থেকে রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসাবে, আর এখানেই নিহিত আছে দ্বিবাচনিকতার পরিসর।

‘**Heteroglossia**’র পরিসর ঢোঁড়াই চরিত মানসে

বাখতিনের উপন্যাসের সংরূপ হিসাবে Heteroglossia নামক একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তাঁর ‘The dialogic imagination’ প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্গত ‘Discourse in the novel’ প্রবন্ধে।এখানে একজনের বক্তৃতা বা speech কে অন্য জনের ভাষায় উপস্থাপন করা হয়---

“ Heteroglossia, once incorporated into the novel (whatever the forms for its incorporation), is another’s speech in another’s language, serving to express authorial intentions but in a refracted way.”(Discourse in the novel, page-324)

সচরাচর এখানে যেটা হয় তা হল উপন্যাসের কোন চরিত্রের মনের ভাবকে তার অন্তর্লোকের চিন্তাভাবনাকে লেখক এমন ভাবে বর্ণনা করেন যেন মনে হয় লেখক বা কথক, উপন্যাসের চরিত্রগুলির মনের গভীরে প্রবেশ করে সবকিছুই দেখতে পাচ্ছেন। লেখকের উদ্দেশ্য কে পরিপূর্ণ করার তাগিদ এখানে থাকে, কিন্তু সেটা সরাসরি নয়, প্রতিসৃতভাব (Refracted way). এই ধারনায় উপন্যাসের বাচন একটি বিশেষ ধরনের ‘double voiced discourse’ তৈরি করে। এটা একই সময়ে দুজন বক্তাকে উপস্থাপিত করে, তারা একসঙ্গে দুটো ভিন্ন উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে,-

“ It serves two speakers at the same time and express simultaneously two different intentions: the direct intention of the character who is speaking, and the refracted intention of the author.” (Discourse in the novel, page-324)

এই ধরনের ডিসর্কোসে দুটো কণ্ঠস্বর, দুটো অর্থ, আর দুটো অভিব্যক্তি থাকে একত্রে, এবং এই দুটো ভয়েস বা কণ্ঠস্বর যখন dialogically interrelated বা কথোপকথনিক ভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত হয়, তখন মনে হয় তারা যেন একে অপরকে জানে, তাদের মধ্যে যেন একপ্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়া কাজ করে, তাদের মধ্যে ডায়ালগের আদানপ্রদান হয়। দেখে মনে হয় তারা যেন একে অপরের সঙ্গে কথোপকথনে রত। ‘discourse in the novel’ এ তাই বলা হয় –

“Double - voiced discourse is always internally dialogized. Examples of this would be comic, ironic or parodic discourse, the refracting discourse of a narrator, refracting discourse in the language of a character and finally the discourse of a whole incorporated genre –” (Discourse in the Novel, page 324)

Heteroglossia সম্বন্ধে ধারনা আসে পলিফনির সূত্র ধরেই- যেখানে অনেকার্থ দ্যোতনার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, অর্থাৎ জগৎ ও জীবন কে দেখা কখনই একটা বিন্দু থেকে সম্ভব নয় , ভিন্নগোত্রীয় অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে রেখে বিচার করতে হয়। উপন্যাসে অনেক সময়ই লেখকের ভাষা সরে গিয়ে চরিত্রের বাচন গুরুত্ব পায়, কখনও কোন চরিত্রের কণ্ঠ নির্গত কথা , আবার

কখনও লেখক কোন চরিত্রের মনের ভাবকে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ নিজের স্বরকে গোপন করে অন্যের স্বর কে যোজনা করেন। এখানেও পলিফনির মতোই বহুস্বরের যোগদান ঘটে, তবে এখানে সেই বিভিন্ন স্বরের সমাপতন দেখা যায়, কেউ কাউকে অস্বীকার করে না। একটা উপন্যাসের কাম্য পরিস্থিতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে Heteroglossia , যেখানে কখনও চরিত্রের প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্য দিয়ে , কখনও আত্মকথনের (inner speech) মধ্য দিয়ে , বা লেখকই পরোক্ষ ভাষ্যে চরিত্রের তির্যক বিচ্ছুরণ ঘটায়।

উপন্যাসে এমন কিছু সমান্তরিত স্বরাগমের পরিস্থিতি তৈরি হয়— বাল্যকান্ডে ঢোঁড়াইএর জন্ম অধ্যায়ে কথক বলেন-“ বুধনীর মনে আছে যে, ঢোঁড়াই যে দিন পাঁচ দিনের সেদিন টৌনে ছিল একটা ভারী তামাসা। আর একদিন আগেই যদি ঢোঁড়াই জন্মায় , তা হলেই বুধনী ছয়দিনের দিন স্নান করে তামাসা দেখতে যেতে পারে ; কিন্তু তা ওর বরাতে থাকবে কেন।”(পৃষ্ঠা ৭)

বা “ওর স্বামীটা ভারি ভালমানুষ। অন্য তাৎমারা বলে হাবাগোবা , তাই রোজগার কম। বুধনীর নিজের রোজগার আছে বলেই , চলে যায় কোনোরকমে।”(পৃষ্ঠা ৮)

এখানে বর্ণনাটা লেখকই করেন কিন্তু নিজের স্বরকে গোপন করে , নির্দিষ্ট চরিত্রের স্বরকে যোজনা করেন তার ভাবনা কে বোঝাতে। এ হল বাখতিন কথিত “another’s speech in another’s language” (discourse in the Novel)

সদ্য প্রসূতি বুধনীর জন্য মুসুর ডাল নিয়ে আসতে ভুলে যাবার আসল কারণ স্বীকার করে তার স্বামী, তখন বুধনীর যে মনোভাব তা আত্মকথনের ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয় –

“ বুধনী মনে মনে হাসে এমন ‘পুরুখে’র উপর কি রাগ করে থাকা যায়। লোকের ঠাট্টাটা পর্যন্ত বোঝে না এ মানুষ ; না হলে কাল হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে আমাকে খবর দেওয়া

হল যে , রাতিয়া 'ছড়িদার' রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছে ওকে যে- ছেলের রঙ মকসূদনবাবুর গায়ের রঙের মতো হয়েছে নাকি।" (পৃষ্ঠা ৯)

কিংবা বুধনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ অংশে- " বুধনীও ভাবে যদি অন্যের পয়সাই নিতে হয়,তবে বয়স থাকতে তাকে বিয়ে করাই ভাল।" (পৃষ্ঠা ১২)

এগুলি বুধনীর অন্তর্ভাষ্য যা তাকে একমুখী চরিত্র হতে দেয় না , একজন সাধারণ অন্ত্যজ নারীর বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

'ঢোঁড়াইয়ের আত্মদর্শন' অংশে এমন ভাবে তার মনের ভাবকে লেখক প্রকাশ করেন যে মনে হয় ঢোঁড়াইয়ের মনটা তিনি পড়তে পারছেন, এবং সেই অনুযায়ী ঢোঁড়াইয়ের মনের ভাবকে তিনি জানাচ্ছেন পাঠকদের -

"বহু দিন প্রতীক্ষার পর বাওয়া ফেরে না। কী জানি কেন, ঢোঁড়াই নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে করে। কিন্তু সত্যিই কি সে দোষী? বাওয়ার উপর ভালোবাসা তার একটুও শিথিল হয়নি; এক বিন্দুও না। বাওয়ার উপর কর্তব্যের ত্রুটি সে করেনি। তার বিয়ে করায় বাওয়ার আপত্তি ছিল না। তবু সে বোঝে যে বাওয়ার চলে যাবার সঙ্গে তার বিয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে ; কিন্তু এমন দোষ সে কি করেছে যে বাওয়া যাবার আগে তার সাথে কথা বলে গেল না।" (পৃষ্ঠা ১১০)

" আর ঢোঁড়াই জন্য সব জায়গায় জোর দেখাতে পারে; রামিয়ার কাছে সে একটু নরম।... কিন্তু তার মন রামিয়ার মধ্যে ডুবে থাকলেও তার দৃষ্টির প্রসার বাড়ছে আস্তে আস্তে, তার জগতটা বড় হয়ে উঠেছে, গাড়ি বলদ কিনবার পর থেকে।" (পৃষ্ঠা ১১১)

- এখানে ঢোঁড়াইের মনের দুর্বল জায়গা কোনটা তা যেমন সে মনে মনে অনুভব করে, তেমনি দৃষ্টির প্রসার বাড়ার কথাটা যেন লেখক জানাতে চান আমাদের , কারণ এই পাক্কীতে গরুর গাড়ি চালানোর সূত্রেই বৃহত্তর জীবনের সাথে সংযোগ গড়ে তোলে ঢোঁড়াই, সে বুঝতে পারে - " জাত পাত আলাদা হলে কী হয়, সব জায়গায় লোকের হালত একই রকম।" – নিম্নবর্গের এক নায়কের রাজনীতি সচেতন সত্তা হয়ে ওঠার পথে এ প্রাথমিক পদক্ষেপ বলা যায় , আর লেখকের refracted intention বোধহয় এটা জানানোই ছিল ।

উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে ভূস্বামীর যশোকীর্তন অংশে বাবুসাহেবের মনের ভাবকে ব্যবহার করেন লেখক-

" বাবুসাহেবের মনটা আজ খুব খারাপ আছে। আজ তাঁর একটা দাঁত পড়েছে। ... তার বয়স হয়ে আসছে। মরবার কথাটা মনে করতে ভয়ভয় করে। কত লোক একশ বছরও তো বাঁচে। হাতের শিরাগুলো বেরুলে কী হয় , এখনও যথেষ্ট 'তাকত' আছে তাঁর শরীরে।" (পৃষ্ঠা ১৩৭)

এই ভাবে উপন্যাস জুড়ে কখনও লেখকের ভাষ্য আবার কখনও লেখক নিজেকে আড়াল করে চরিত্রের অন্তর্ভাষ্যক ফুটিয়ে তোলেন, উপন্যাসের সংরূপের মধ্যে 'double voiced discourse' এর একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। এখানে একাধারে লেখকের অভিপ্রায় ও বাবুসাহেবের অভিপ্রায়ের সমাপতন ঘটে। বাবুসাহেব সামগ্রিক ভাবে চিন্তিত তার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষমতা হ্রাস পাবার জন্য- এটাই হল direct intention of the character who is speaking. আর লেখকের অভিপ্রায় হল সামন্ততন্ত্রের ক্ষমতালিপ্সা, ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য তীব্র বাসনাকে দেখানো, এটাই হল –'the refracted intention of the author'.

'অভীষ্ট পূরণে বাবুসাহেবের উল্লাস' অধ্যায়ে বাবুসাহেব নিজের মনে মনে যে কথা বলেন তা যেন লেখকের সাথেও তার কথোপকথন-

“ বাবুসাহেবের পায়াভারি খানদান। কিছুদিন টাল খেয়ে পড়েছিল। এতদিনে আবার মাথা উঁচু করে জমিয়ে বসেছে গাঁয়ে। লাডলীবাবুই না একটু বিপথে গিয়ে অমন পরিবারটারজলুস একটু কমিয়ে দিয়েছিল, সেই লাডলীবাবুর কল্যাণেই তাঁদের ছাতলাধরা বাড়ি ঘরদোর আবার চকচকে ঝকঝকে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দারোগা হাকিমের চোখেও তাদের কলঙ্কের দাগ মুছেছে। আসলে সব হয়েছে সময়ের গুণে; কিন্তু বাবুসাহেব বাড়িতে বলেন যে, তিনি সংসারের ভার আবার হাতে নিয়েছেন বলেই সামলাতে পেরেছেন।”(পৃষ্ঠা ১৮২)

এখানে বাবুসাহেবের অভীষ্ট পূরণের উল্লাসের কথা পাঠককে জানানোর সাথে সাথে লেখকের পরোক্ষ অভিপ্রায় হল এটা জানানো সময়ের সাথে বাবুসাহেবের বিরুদ্ধে থাকা পুলিশ,দারোগাও তার পক্ষে হয়ে গেছে। এর ফল ঢোঁড়াইদের জন্য শুভকর হবে না।

আর এর পরবর্তী অংশটা another’s speech in another’s language এর ভালো উদাহরণ, -

“ বাবুসাহেব আজ সাঁঝের পর এখনও বাড়ির ভিতরে যাননি। গিধর মণ্ডলের জন্য অপেক্ষা করছেন। গিধর আজকাল প্রায় রোজ আসছে। সংসারের কাজে তালিম দেবার জন্য বাবুসাহেব নাতিকে নিয়ে বসেন এই সময়টা। আজকে গিধর সেই ব্যাপারটার একটা অন্তিম নিষ্পত্তি করে আসবে বলেছে। সব হয়েই এসেছে। গিধর করেছে এবার খুব। কাজটা করেছেও বেশ গুছিয়ে। আজকে খবরটা শুনবার পর তবে তিনি গিয়ে পূজোয় বসবেন। ...। গাঁয়ের লোকের মন না মতি। ঘুঘু গিধর মণ্ডল এই নরম জেয়গাটায় ঘা দিতে পেরেছিল।” (পৃষ্ঠা ১৮২)

Dialogically interrelation দেখা যায় দ্বিতীয় চরণের 'দিব্যদৃষ্টি লাভ' অধ্যায়ে , এখানে লেখক জানাচ্ছেন – " পাক্কী ঢোঁড়াইয়ের কাছে একটা সজীব জিনিস। তার কোন রকম সন্দেহ নেই যে পাক্কীটা অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। লোহাতে ঘুণ ধরেছে , সোনাতে মরচে পড়েছে; একি কলির শেষ হয়ে এল নাকি? ...। দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে।" (পৃষ্ঠা ২১৩) – এখানে নায়ক ঢোঁড়াই যার কাছে পাক্কী ছিল একমাত্র অপরিবর্তনীয় জিনিস, সেই পাক্কীও বদলে যায় , আর লেখকের এটা জানানো উদ্দেশ্য ছিল কী ভাবে সময়ের বদলটা নাড়া দিচ্ছে ঢোঁড়াইকে। আবার যখন ঢোঁড়াই ভাবে _ " বদলায় অথচ বদলায় না। পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়।" (পৃষ্ঠা ২১৩)

এই ভাবে উপন্যাসে বহু জায়গায় লেখকের ভাষ্য আর চরিত্রের ভাষ্য মিলেমিশে আছে।

Autonomous চরিত্র হিসাবে ঢোঁড়াই

Problem's of Dostoevesky's Poetics গ্রন্থে আমরা বাখতিনীয় ধারনায় হিরোর যে ইমেজ পাই তাতে হিরোকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর রূপে দেখানোর কথা বলা হয়, সেখানে এটা গুরুত্বপূর্ণ না যে হিরো কীভাবে জগতে ধরা দিচ্ছে বরং এটা গুরুত্বপূর্ন যে জগত কীভাবে হিরো বা নায়কের দৃষ্টিতে ধরা দিচ্ছে। এই মাত্রাকে ধরে যদি ঢোঁড়াইয়ের জগতকে দেখি সেখানে দেখব লেখক এটা দেখানোর উপর জোর দিয়েছেন যে -

ঢোঁড়াইয়ের জগত, চারপাশের পরিবেশ কীভাবে তার কাছে ধরা দিচ্ছে, কীভাবে তার চেতনায় আঘাত করে তাকে বদলে দিচ্ছে, - মা বুধনী, রামিয়া, পাক্কী, সাগিয়া এবং বিসকান্ধার রাজনীতি হল সেই জগত যা নায়কের চেতনায় নানাভাবে আঘাত হানে, এবং উপন্যাসের শেষে গিয়ে নিতান্ত সাধারণ নিম্নবর্গীয় এক নায়ক থেকে চেতনাসম্পন্ন এক ট্রাজিক নায়কে পরিণত হয় সে।

অতি শৈশবে ঢোঁড়াইয়ের মা যখন নিশ্চিন্ত স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রলোভনে পিতৃহারা ঢোঁড়াইকে অনাথ করে দিয়ে বাবুলালের সাথে নতুন করে ঘর বাঁধে – সেই অভিমান ছোট ঢোঁড়াইয়ের চেতনায় এমন ভাবে স্থায়ী হয়ে যায় যে শুধু মায়ের প্রতি নয়, জাতের বিরুদ্ধেও তার একপ্রকার সুপ্ত, প্রতিবাদী স্বর গড়ে ওঠে – যা পরবর্তীতে তাকে জাত বিরোধী আচরণে প্ররোচিত করে।

ঢোঁড়াইয়ের শরীর খারাপের সময় বুধনী তাকে নিজের কাছে এনে সেবা করতে চাইলেও ঢোঁড়াইয়ের মন প্রতিবাদী হয়ে ওঠে –

" ঢোঁড়াই গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্য দিকে তাকিয়ে। তার একটুও ভাল লাগে না এই লাল খোকাটাকে, আর তার মা'টাকে; বাওয়ার কাছে চলে যেতে ইচ্ছা করে। তার চোখ ফেটে কান্না আসবে বোধ হয়। রাম রাম! সে কোন কথা না বলে দৌড়ে পালিয়ে যায় 'থানের' দিকে।"(পৃষ্ঠা ১৭)

ছোট থেকে যে স্নেহ ঢোঁড়াই পায় নি, হঠাৎ করে পাওয়া সেই স্নেহকে সে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। এখানে চরিত্রটির আচরণ কোথাও লেখকের ইচ্ছার অধীন বলে মনে হয় না, সে যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এটা করে।

আবার তাৎমা সমাজে পঞ্চায়েত হল সর্বশক্তিমান। তাদের বিরুদ্ধাচারণ করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবে না, কিন্তু ঢোঁড়াই হল এর ব্যতিক্রম। মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করে যখন সারা দেশ উত্তাল, তার ঢেউ এসে পড়ে তাৎমাটুলিতেও। উৎসাহের আতিশয্যে ধনুয়া মহতো রবিবারে গানহী বাওয়ার নামে কাজে যেতে না চাইলে, ঢোঁড়াই বেঁকে বসে, কারণ রবিবারের রোজগারই তার আসল রোজগার। কেবলমাত্র রবিবারই ভিক্ষে দেয় এমন কয়েকটি পরিবার আছে।

কিছুটা বয়স বাড়লে ভিক্ষের রোজগারে কেমন যেন কুণ্ঠিত বোধ করে, তাই বাওয়ার ভিক্ষেয় বেরোনর আগেই সে অন্যত্র সরে পড়ে। তাদের থেকে জাতে নিচু ধাঙড়দের সঙ্গে মেলামেশা করে, রাস্তা মেরামতির কাজ চায় তাদের কাছে , এই ভাবে তাৎমা সমাজের বিরুদ্ধে চলে যায় সে। তার এসব আচরণ জাতের কেউই পছন্দ করে না, কিন্তু ঢোঁড়াই এসবের মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ জানায় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বা Autonomous চরিত্র হবার দিকে এগিয়ে যায়, তার এই প্রতিবাদগুলির মধ্য দিয়েই।

এরপর ঢোঁড়াই তাৎমাদের ধর্মীয় অনুশাসনে আঘাত করে, যা কখনই লেখক তাকে দিয়ে করাচ্ছেন বলে মনে হয় না, এ যেন লেখক যে ‘ঢোঁড়াই রাম’কে আঁকতে চেয়েছেন তার নিজস্ব প্রতিবাদের রূপ। তাৎমাটুলিতে অল্প সময়ের জন্য এসেছিল পৈতেধারী মহগুদাস। তার মোটা হলদে পৈতে দেখে ঢোঁড়াইয়ের তীব্র বাসনা জাগে তা ধারণ করবার। কিন্তু তাৎমারা তা চায় না, তাদের পুরোহিত মিসিরজীও তা চায় না। কিন্তু ঢোঁড়াই দু-পয়সা দিয়ে পোস্টকার্ড কেনায়, ও মিসিরজিকে দিয়ে লিখিয়ে অযোধ্যায় গুরুকে পাঠায়। গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে যায়, এর আগে এরকম ঘটনা তাৎমাটুলির ইতিহাসে ঘটেনি। একমাসেও চিঠির উত্তর না এলে, ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে সোনাবর্গা থেকে বামুন এনে, মাথা নেড়া করে পৈতে নেয় ঢোঁড়াই সহ গ্রামের পুরুষেরা। ঢোঁড়াই ভকত হয়ে যায় ঢোঁড়াইদাস, তার নেতৃত্বে এক বিরাট বিপ্লব সাধিত হয় তাৎমা সমাজে। ঢোঁড়াইয়ের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জাত, সমাজ এমনকি ঈশ্বরের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের স্বর শোনা যায়- যেখান থেকে বোঝা যায় জগত ও জীবন কীভাবে ধরা দিচ্ছে নায়ক ঢোঁড়াইয়ের চোখে –

“ দুখিয়ার মা না হয় বদ; সে না হয় ঢোঁড়াইকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল,কিন্তু মহতো নায়েবরা সে সময় কী করছিল? তাৎমা জাতটা কী করছিল? বাওয়া ছাড়া আর কেউ তার কথা

ভাবেনি কেন? সকলের বিরুদ্ধেই তার অনেক কিছু বলার আছে। আর রামজী "বজরংবলী মহাবীরজী" তারা কি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন?এদের উপরও অভিমান ঘনিয়ে ওঠে তার মনে।" (পৃষ্ঠা ৬২)

জগৎ ও জীবন কীভাবে ধরা দিচ্ছে নায়কের দৃষ্টিতে তা ঢোঁড়াইয়ের পাক্কীকে দেখার সূত্রেও জানা যায়, তার চেনা পাক্কী যার কোন বদল নেই বলে মনে হত, তাও কীরকম বদলে যায়। পাক্কীতে কাজ করার সূত্রে ঢোঁড়াইয়ের জানার জগতের অনেক প্রসার ঘটে। দেশের বিরাটত্বের একটা আবছা ছায়া এসে পড়ে তার মনের উপর। রাস্তা মেরামতির কাজ ছেড়ে যখন সে বলদ গাড়ি কিনে তার চালক হয়, তখন দৃষ্টির প্রসারতা বাড়ে।

"পাক্কীতে কাজ করবার সময় দূরের 'বাটোহী'র সঙ্গে দেখা হত তার পথের উপর। এখন সে নিজেই গাড়িতে মাল বোঝাই করে কত দূরে দূরে চলে যায়,...। 'জাত পাঁত' আলাদা হলে কী হয়, সব জায়গায় লোকের হালত একই রকম।" (পৃষ্ঠা ১১১)

তাৎমাটুলি ত্যাগ করে ঢোঁড়াই যখন বিসকান্ধায় পৌঁছায় সেখানেও সে ধীরে ধীরে কৃষকদের কাছে নেতৃত্বস্থানীয় হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমির মালিক বচ্চন সিং গরীব কৃষকদের ঠকিয়ে বিরাট সম্পত্তির অধিকারী হন। ঢোঁড়াই লড়াই,সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের মতো করে চিনে নেয় বাবুসাহেবের, জমিদারের রাজনীতিকে। এরপর

ঢোঁড়াই যখন আজাদদস্তায় পালিয়ে যায়। সেখানেও সে জগৎ ও জীবনকে নিজের মতো করে চিনে নেয়। এখানে সে একটু উগ্র প্রকৃতির দেশসেবকদের দেখে। তারা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে আজাদীর নামে টাকা সংগ্রহ করে। আসল রাজনীতির পাঠ পায় ঢোঁড়াই এখান থেকে। আজাদদস্তার নাম হয় ক্রান্তিদল, তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে পা বাড়ায়। এখানে ঢোঁড়াইয়ের নতুন নামকরণ হয়, রামায়ণজী। একসময় এই রামায়ণজী ক্রান্তিদলের স্বেচ্ছাচারিতা,অমানবিক

আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এইভাবে ঢোঁড়াই হয়ে ওঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক চরিত্র, যে কেবলমাত্র লেখকের ইচ্ছার অধীন বলে মনে হয় না কখনই, সমাজ, রাজনীতি সম্পর্কে তার নিজস্ব একটা পর্যবেক্ষণ তৈরি হয়, যা দিয়ে সে রাজনীতির ভেতরের রাজনীতিকে চিনতে শেখে।

ক্রনোটপগত ধারনা -

উপন্যাসটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ব্যবহার করেছে ঢোঁড়াইয়ের হয়ে ওঠার পথে। ১৯১২ থেকে ১৯৪৫ এই সুদীর্ঘ সময় পর্বের রাজনীতিকে ধারণ করে আছে উপন্যাস। ফলত Time and Space বা সময় ও স্থানের গুরুত্ব এখানে কম নয়। বরং বিশেষ ওই কালপর্বকে না বুঝলে ঢোঁড়াইয়ের নিম্নবর্গের প্রতিনিধি থেকে রামায়ণজী হয়ে ওঠার যাত্রাকে বোঝা যাবে না। ক্রনোটপের আলোচনায় আসল প্রশ্ন হল, মানুষ ও তার সক্রিয়তা, জীবনের প্রতিটি ঘটনার সাথে দেশিক, কালিক জগতের সম্পর্ক – আর ঢোঁড়াইকে সতীনাথ এভাবেই আঁকেন , তার জীবনের প্রায় সব ঘটনার সঙ্গে তৎকালীন সময়, রাজনীতিকে জুড়ে দেন। যেমন-

১৯১২ সালে ঢোঁড়াইয়ের জন্ম, সেই বছরই দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে উৎসব, ১৯১৯-১৯২০ সালে ঢোঁড়াইয়ের অসুখ করে যে বছর , সেই বছরই দেশে হরতাল ও মাদক দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৩০ এ গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহের ডাক দেন, সেই আন্দোলনে উত্তর বিহার,ভাগলপুর,পূর্ণিয়ার মানুষ উত্তাল হয়ে ওঠে, যার ঢেউ এসে লাগে ঢোঁড়াইদের তাৎমাটুলিতেও, মরণাধারের পাড়ে আর সকলের সঙ্গে ঢোঁড়াই ও রামিয়াও যায়। এখানে স্থান ও কাল দুটোই ঢোঁড়াইয়ের জীবনের বিশেষ গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ এই ঘটনায় বাওয়ার মনে হয়, মরণাধারের কাছে নতুন থান গড়ে উঠলে, তার থানের গুরুত্ব কমে যেতে পারে, যা তার ঢোঁড়াইকে ছেড়ে অযোধ্যায় চলে যাবার ঘটনাকে তরান্বিত করে। বা

১৯৩৪ সালের সমগ্র বিহার জুড়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা, যা ঢোঁড়াইকে পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক জীবনের দিকে এগিয়ে দেয়। কারণ কৃষিজমির বালি সরাবার কাজে, কুয়ো সারাবার কাজে এগিয়ে গিয়ে ঢোঁড়াই কংগ্রেসি ভলেন্টিয়ার নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানেও ঢোঁড়াইয়ের জীবনের ঘটনার সাথে নির্দিষ্ট দেশ ও কালের সংযোগ, একথা বললে ভুল হবে না। আবার ১৯৪২ সমগ্র বিহার জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলন, যখন ঢোঁড়াইরা উত্তেজনার বশে তিতলি কুঠি দহন করে, এখানেও নির্দিষ্ট সময় (time) আর স্থান (space) নিয়ন্ত্রণ করছে নায়ক ঢোঁড়াইয়ের কার্যকলাপকে। উপন্যাসে ঢোঁড়াইয়ের আজাদ দস্তায় প্রবেশ ও সেই সূত্রে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসা সবই ৪২ এর রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের সময় গান্ধীজী নিজের দলের আত্মগোপনকারীদের ‘সারেণ্ডার’ করার নির্দেশ দেন, এই সময় সবদিক থেকে ব্যর্থ ঢোঁড়াইও উপন্যাসের শেষে, এগিয়ে যায় এস.ডি.ও অফিসের দিকে সারেণ্ডার করতে। সুতরাং ঢোঁড়াইয়ের সমগ্র জীবনের ঘটনাপ্রবাহ কমবেশি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সময় ও স্থান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

উপসংহার

গবেষণা প্রস্তাবের ভূমিকাতে যে অন্বেষণের কথা বলা হয় – এক রুশ তাত্ত্বিকের তত্ত্বকে আমাদের সাহিত্যের নিরিখে বিচার করে দেখার , তত্ত্বের সার্থকতাকে খুঁজে দেখার ইচ্ছার কথা- তা কতটা সার্থক হল তা এবার ভেবে দেখা দরকার। এই সার্থকতার প্রশ্ন এলে প্রথমেই যেটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো- বাখতিন এক বিশেষ ধরনের উপন্যাসের নিরিখেই তার তত্ত্বগুলিকে খাড়া করেন, তা হল দস্তয়েভস্কির উপন্যাস- বাংলা সাহিত্যের যেকোন উপন্যাসই বাছি না কেনো তা সময় ও স্থানের নিরিখে অনেকটাই আলাদা। তাই সামগ্রিক ভাবে উভয়ের মধ্যে খুব যে মিল পেয়েছি তা বলা যায় না। এটা দস্তয়েভস্কির কয়েকটি উপন্যাসের বিষয়ের সাথে আলোচ্য সতীনাথের উপন্যাস দুটির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বোঝানো যেতে পারে।

যেমন ‘ Notes from The Underground Man’ – first person narrator বা উত্তম পুরুষের বাচনে লেখা- উপন্যাসটি শুরুই হয় নামবিহীন কথকের কথা দিয়ে, জীবন সম্পর্কে সে তিক্ত এবং মনুষ্যদ্বেষী, একাই সেন্ট পিটারসবার্গে বাস করে, দুটি বিভাগে বিভক্ত এই উপন্যাসে প্রথম ভাগে কথক তার পরিচয় দেয়, সমাজ সম্পর্কে তার বিরুদ্ধ শত্রুভাবাপন্ন ধারনার কারণ ব্যাখ্যা করে। প্রথম যে শব্দ গুলি তার কাছ থেকে শুনতে পাই যে- সে একজন অসুস্থ, দুর্নীতিপরায়ণ , কুৎসিত মানুষ – যার মধ্যেকার আত্মঘৃণা ও আত্মবিদ্বেষ তাকে দূষিত, বিকলাঙ্গ করেছে। এই Underground Man এর উনিশ শতকীয় উপযোগবাদ বা হিতবাদের (এটা মানুষের সকল চাহিদার যৌক্তিক প্রমাণ দেয়) প্রতি এক তীব্র অবজ্ঞা ছিল । এই উপন্যাসের শুরু তে বলা হয়- “শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করে, কী যে বাজে অবস্থা! মনে হচ্ছে লিভারের একটা গন্ডগোল হয়েছে। অসুখটা ঠিক কী জানি না। কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে তাও ঠিক করে বলতে পারব না। ওষুধ আর ডাক্তারের উপর ভক্তি আছে, তবু

ডাক্তার দেখাচ্ছি না। ... । অবশ্য আমার রাগে সর্বনাশটা ঠিক কার হবে বলতে পারব না। খুব ভালো ভাবেই জানি,আমি ডাক্তার না দেখালে ডাক্তাররা না খেয়ে মরবে না। ...। তারপরও কেবলমাত্র রাগে ডাক্তার দেখাই না।" (অজ্ঞাতবাসের পত্র, নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড ম্যানের অনুবাদ, অনুবাদক খন্দকার মজহারুল করিম, পৃষ্ঠা –৯)

'Crime and Punishment' উপন্যাসে দেখা যায় রাসকলোনিকভ নামে এক দরিদ্র বিশৃঙ্খল ছাত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়, সেন্টপিটারসবার্গে বসবাসকারী এই ছাত্রটি পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে অসাধারণ কোন ব্যক্তিত্বের ব্যবহারিক নৈতিকতাকে অতিক্রম করার অধিকার আছে। উপন্যাসটি psychopathology of guilt এর অসাধারণ নিদর্শন। সমাজ ও নিজের কল্যাণ করবার অভিপ্রায়ে সে অনেক পরিকল্পনা করে এক বন্ধকগ্রহীতাকে হত্যা করে, তার সব অর্থ হস্তগত করবে বলে। শেষে এর জন্য সে অপরাধ বোধে দগ্ধ হতে থাকে, সব সময় তার মনে হয় এই বুঝি সবাই সব বুঝে যাবে। তাই সে সকল প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করে , এই ভাবে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে ও ধীরে ধীরে এক সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

দস্তয়েভস্কির উপন্যাসগুলি আসলে অনেকটা রোমাঞ্চকাহিনির মতো, তার সাথে যুক্ত হয় এক মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ও বিশ্লেষণের কথা। বাখতিন ও রোমাঞ্চ কাহিনির নায়কের সাথে দস্তয়েভস্কির নায়কদের মিল খুঁজে পান , এদের কারুরই সামাজিক প্রতিনিধিত্বের দায় নেই , তাই এরা অনেক বেশি স্বাধীন, আমাদের চোখে এদের কার্যকলাপ কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকে, অনেক ক্ষেত্রেই এরা যা ইচ্ছা তাই ঘটাতে পারে, অপ্রত্যাশিত অস্বাভাবিক সব অবস্থা তৈরি হয় , যেখানে চরিত্ররাও এমন সব আচরণ করে যা আপাত দৃষ্টিতে আমাদের অযৌক্তিক বলে মনে হবে । অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ সম্পাদিত 'উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব' বইতে দেবেশ

রায় – "মিখাইল বাখতিন ও তাঁর উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে লেখেন – " ফ্যানটম বা জেমস বন্ড এর মতো অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতিতে দস্তয়েভস্কির চরিত্রগুলি পড়ে বটে কিন্তু সেই পরিস্থিতি তাকে আরও উন্মোচিত করে , সেই উন্মোচনের ফলে সেই চরিত্রের ধ্যানের জগত আরো নতুন আঘাতের সম্মুখীন হয়, সেই ধ্যানের মানুষটির ওপর আরো নতুন নতুন আঘাত এসে পড়ে।"

স্বভাবতই এটা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই যে, সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' বা 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' কোথাওই এরকম ঘটনা, বা চরিত্ররা নেই যাদের আপাত ভাবে অযৌক্তিক, বিশৃঙ্খল বলে মনে হয়। তার চরিত্রদের বিলু, নিলু বা ঢোঁড়াইদের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন আছে ঠিকই কিন্তু তার ধরণ আলাদা, এদের ঠিক যুক্তি পরম্পরাহীন মনে হয় না। সমাজের প্রতি এদের প্রতিবাদ থাকলেও , দস্তয়েভস্কির চরিত্রদের মতো পুরোপুরি ব্যবহারিক নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করে নয়। কিন্তু তা হলেও কিছু মিলও আছে, যার ভিত্তিতে বাখতিনের পলিফনি, ডায়ালজি, heteroglossia প্রভৃতি তত্ত্ব গুলিকে নতুন রূপে কিছুটা খুঁজে দেখা যায় এই বাংলা উপন্যাসগুলিতে। আর প্রয়াসটা প্রাথমিক ভাবে ছিল এই খুঁজে দেখারই। যেমন দস্তয়েভস্কির চরিত্ররা সব সময় নিজেদের কথা বলে মনে মনে, আর কথক যেন সেই সব শুনতে পায়, এরা কখনও আলাপ করে না, চরিত্র গুলির জীবনের অনেকটাই জানা যায় তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে – এর সাথে 'জাগরী'র রচনার রীতির মিল পাই, এখানেও চরিত্ররা স্বগত সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের জীবনের অনেক কথা পাঠককে জানান।

আবার 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে বাখতিন নির্দেশিত প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স ও পরোক্ষ ডিসর্কোস , একই সঙ্গে দুটি কণ্ঠস্বরের – দ্বিস্বর ডিসর্কোসের নিদর্শন পাওয়া যায় খুব স্পষ্ট ভাবেই। উপন্যাসে যতবার কোন চরিত্রের কথনকে ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক ভূমিকানুগ কথন

পরিস্থিতি তৈরি করেন তখন সেখানে একই সঙ্গে দুটি স্বরের সক্রিয়তা খুব ভালো ভাবে বোঝা যায়, লেখকের স্বরের মধ্যেই সেখানে নিহিত থাকতে দেখি চরিত্রগুলির স্বরকে । তবে প্যারডি, আয়রনিক রচনার ক্ষেত্রে একটু বেঁকিয়ে, একজনের স্বরের নকল অন্যজন করে সেই ব্যাপারটা এখানে নেই, যদিও বাখতিনের দ্বিস্বর ডিসর্কোসের এটাও একটা ভাগ।

পরিশেষে তাই বলা যায়, বাখতিন দস্তয়েভস্কিকে নতুন ভাবে পড়ান, ভাবান, ব্যাখ্যা করেন, আবার সেই উপন্যাস তত্ত্বগুলিকে নিয়ে যদি আমরা আমাদের সাহিত্য কে নতুন ভাবে পড়ি, ভাবি, ব্যাখ্যা করি তাতে জ্ঞানের প্রসারতাই বাড়ে, যা বাংলা সাহিত্যের পাঠকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করে।

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি

১. অচিন্ত্য বিশ্বাস। মিখাইল বাখতিন উপন্যাস তত্ত্ব। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪।

২. অঞ্জন সেন, উদয় নারায়ন সিংহ (সম্পাদনা)। উপন্যাসের সাহিত্য তত্ত্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট, ২০১০।

৩. অরুণ সোম। অপরাধ ও শাস্তি (রুশ থেকে অনুবাদ)। সাহিত্য একাডেমি। প্রথম প্রকাশ ২০০০।

৪. গোপীচান্দ নারঙ । গঠনবাদ, উত্তর গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব। সাহিত্য অকাদেমি । ২০০৯।

৫. তপোধীর ভট্টাচার্য । বাখতিন । এবং মুশায়েরা। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০৫ জুন ২০০২।

৬. তপোধীর ভট্টাচার্য। বাখতিনঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ । প্রকাশক অনুপ কুমার মাহিন্দার। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬।

৭. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় । পোস্টমডার্ন ভাবনা ও অন্যান্য। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭।

৮. রনবীর লাহিড়ী । আখ্যানতত্ত্বের আখ্যান। চর্চাপদ। প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১১।

৯. সতীনাথ ভাদুড়ী । জাগরী । বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৪৫।

১০.সতীনাথ ভাদুড়ী । ঢোঁড়াই চরিত মানস। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৯৪৯।.

১১.স্বস্তি মণ্ডল। জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিত মানস । দে'জ পাবলিশিং । প্রথম প্রকাশ ১ লা জানুযারি ১৯৮৫।

পত্র-পত্রিকা

১. তাপস ভৌমিক (সম্পাঃ)। কোরক। সতীনাথ সংখ্যা। বইমেলা।জানুযারি -এপ্রিল ২০০৬

২. আফিফ ফুয়াদ (সম্পাঃ)। দিবারাত্রির কাব্য। সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা। (তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা)।জুলাই- সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬।

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

1. Bakhtin, M.M. The Dialogic Imagination: Four Essays (trans. C. Emerson and M. Holquist .ed. M. Holquist) Austin. Tex: Universsity of Texas Press.

2. Bakhtin, M.M. Problems of Dostoevsky's Poetics. (trans. And ed. C. Emerson) . Minneapolis, London. University of Minnesota Press. 1984.

3. Bakhtin, M.M. Rabelais and His World (trans. H. Iswolsky). Bloomington. Ind : Indiana University press. 1984.